পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন। জঙ্গল
জনসত্ত্বা। শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি
সেপ্টেম্বর ২০১৫। মূল্য ১২ টাকা

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের জঙ্গলে বেপরোয়া পোচিং

পাহাড়ে কাল নতুন নেতা কে!

জাল নোটের হেডকোয়ার্টার মালদা

বানভাসি লোয়ার আসাম

হ্যামিলটনগঞ্জ। রাজবংশী ডিশে ওষুধির গুণ। চাইবাসা সমাধিস্থল। খুচরো ডুয়ার্স

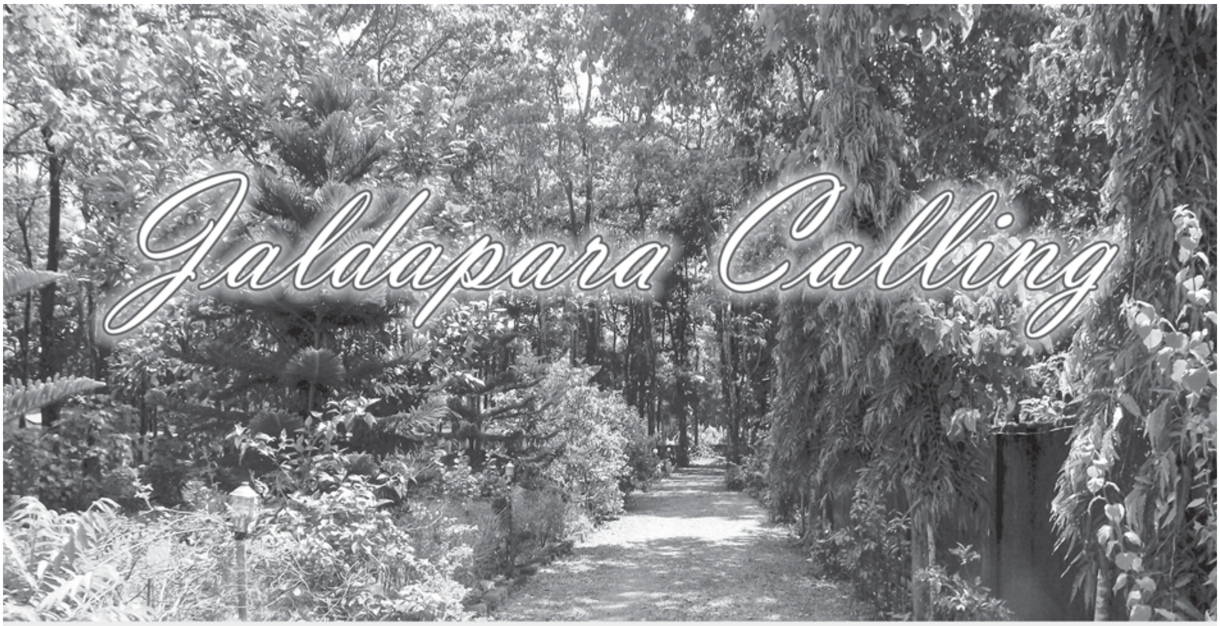

Facilities : A.C. Conference Hall • A.C. Restaurant & Bar • Swimming Pool • Children Park • Laundry Service • Car Parking Facilities • Village Tour available on request • Local Adibashi, Rava • Boro dance on demand • Light Music Amusement

Special Sightseeing : • Jaldapara National Park • South Khairbari Nature Park • Kunja Nagar Eco Park • Phuntsholing (Bhutan) • Chilapata Jungle Safari • Buxa Fort • Jayanti • Totopara • Cooch Behar Rajbari • The Buxa Tiger Reserve • Bhutan Ghat

Resort Heaven Inn Jaldapara NH.31c, Near Jaldapara National Park, Madarihat 735220
Ph no : 03563-262357 Cell : 97331-49811, 97331-63466, 94341-42088
Email : resortheaveninn@gmail.com, www.resortheaveninnjaldapara.com

Resort
HEAVEN INN JALDAPARA

জলপাইগুড়ি শহরে এবার উন্নয়নের বান

সওয়া শতাব্দী অতিক্রান্ত জলপাইগুড়ি পৌরসভার ইতিহাসে এই প্রথম সার্থক বান ডেকেছে। এ বান উন্নয়নের। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস পৌরসভার উন্নয়নের তরীর পালে লাগিয়েছে সুবাতাস। শহর জলপাইগুড়ি আজ নিশ্চিত হয়েছে তাঁর ভবিষ্যতের প্রশ্নে। পুরবাসী জানেন যে, তাঁর প্রিয় শহর, অতীত বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের নতুন রাজধানী বহুদিনের বঞ্চনার গ্লানি আর হতাশা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে উন্নয়নের কিরণছটায়।

সত্যিই আজ পুরবাসীর পায়ের নিচের রাস্তা সুনির্মিত, প্রশস্ত এবং পথবাতির উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। রাজবাড়ির দীঘি সংস্কারের কাজ চলছে তড়িৎগতিতে। সেজে উঠেছে জুবিলী পার্ক। পুনস্থাপিত ঠাকুর পঞ্চাননের মূর্তি পেয়েছে প্রাপ্য সম্মান। সাফাই কর্মীদের তৎতরতায় পরিচ্ছন্ন শহর। অভাবিত গরমের দিনগুলিতে চব্বিশ ঘণ্টা অক্ষুণ্ণ পানীয় জলের সরবরাহ। রাস্তা ভিজিয়ে দিতে নিরলস ভ্রাম্যমান জলগাড়ি।

আরও আছে। গতিময় কর আদায়। সুচিন্তিত নাগরিক পরিষেবা। দ্রুত শংসাপত্র সরবরাহ। মাত্র কয়েক মাস আগে আসা নতুন পুর বোর্ড উত্তরের এই বিশিষ্ট শহরকে কী দ্রুত বদলে দিচ্ছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এর পেছনে রয়েছে পুরপতি শ্রী মোহন বোসের সুযোগ্য নেতৃত্বে কর্মরত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সদাজাগ্রত নজরদারি। আর এর অনুপ্রেরণা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরবাসীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উন্নয়নের। যে বাঁধ এতদিন আটকে রেখেছিল উন্নতির স্রোত, তা তিনি ভেঙে দিয়েছেন। শহরের শুকনো খাতে এখন প্লাবন। কিন্তু এ প্লাবন ধ্বংসের নয়, জলপাইগুড়িকে পুর কর্পোরেশনে নিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ। এ প্লাবন ভাঙনের নয়, করলা নদীকে রূপসী করে তোলার ব্রত। এ প্লাবন হাহাকারের নয়, শরতের নীল সাদা রঙে সেজে ওঠা স্পোর্টস কমপ্লেক্স আর ইন্ডোর স্টেডিয়ামের হাত ধরাধরি করে থাকার হাসি।

শুনতে স্বপ্ন মনে হলেও এ আসলে মা মাটি মানুষের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন নতুন পৌরবোর্ডকে ঘুমিয়ে থাকতে দেয় না। অফুরান কাজের নেশায় জাগিয়ে রাখে। এল.ই.ডি.-র নরম আলোয় লালন করে স্বপ্নকে। শহরবাসী আমাদের শক্তি। উন্নয়নের পতাকাকে বহন করার শক্তি। আসুন গলা মিলিয়ে বলি —

করলা মোদের টেমস এবং তিস্তা মোদের গঙ্গা।
মা মাটি মানুষ বদলে দেবে উন্নয়নের সংজ্ঞা।

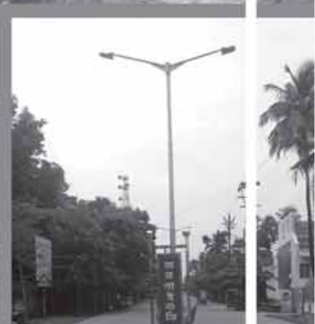

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

পাহাড় থেকে মেঘ এসেছে গুম্‌গুমানি ডাকে
পাগলি হাওয়া উঠল ফুঁসে গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
এই দুয়ারে ওই দুয়ারে ঝাপটা এসে লাগে
ডুয়ার্স মানে বৃষ্টিধারা আসেই না তো বাগে।

বাঘ ভিজেছে বনের ভেতর, স্নান করেছে হাতি
শীর্ণ নদী ছুটতে থাকে সত্যি রাতারাতি।
বৃষ্টি তুমি এবার পালাও, শ্রাবণ গেছে চলে
ভিজিয়ে দিলে আমার মাটি ঝম্‌ঝমানি জলে।

নরম কাদায় ধান বুনেছি, কষ্ট তো রোজ বুনি
এবার একটু অন্য দিনের খবর নাহয় শুনি।
হাসতে গেলে টোল পড়ে না, চোয়াল গেছে ভেঙে
তাও দ্যাখো আজ সেই হাসিতেই সবুজ ওঠে রেঙে।

পাহাড় থেকেও অনেক উঁচু অনেক অবহেলা
সারল্যেরই সুযোগ নিয়ে ঠকিয়ে যাবার খেলা...
ধানের কথা ভাবলে তবু শরীরটা শিরশিরায়
আলোর বেণু উঠল বেজে আমার হাতের শিরায়।

ছন্দে অমিত কুমার দে । ছবিতে সৌরভ সিকদার

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
বিপণন দপ্তর বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, **ইমেল** ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫

এই সংখ্যায়

ডাকে ডুয়ার্স	‘পোচার’ আরও অনেক বাড়াতে হবে!	৬
	বৃক্ষ নিধন— পথ দেখাচ্ছে বালিয়ামারি	৭
প্রতিবেশীর চিঠি	কাল কে নেতা বাংলার পাহাড়ে?	৯
ধারাবাহিক ডুয়ার্স	সোনালি চা-শ্রমিক সমবায়ের সাফল্যে ভীত কায়েমি শক্তি জোটবদ্ধ হয়েছিল	১৩
ডুয়ার্সের ডিশ	রাজবংশী খানায় থাকে ওষুধের গুণ	১৭
সীমান্তে ডুয়ার্স	ছিটমহলের ছেঁড়া কথা	১৮
পর্যটনের ডুয়ার্স	যেখানে ঘুমিয়ে আছে ডুয়ার্সের ইতিহাস-সাক্ষীরা	২১
খুচরো ডুয়ার্স		২৩
পাঠকের ডুয়ার্স	হ্যামিল্টনগঞ্জ : শত সমস্যাতেও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল	২৬
ধারাবাহিক কাহিনি	তরাই উৎরাই	৩০
ধারাবাহিক উপন্যাস	বসন্তপথ	৩৪
গল্প	একটি সন্ধে ও নায়ক হওয়ার ইচ্ছে	৩৯
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স		৪৩
সাহিত্যের ডুয়ার্স	গাঙ্গুটিয়ার সনৎ চট্টোপাধ্যায় ডুয়ার্সের কবি আজ চোখে দেখতে পান না	৪৬

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয় বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super deluxe (non AC)	Rs 600	800
Deluxe AC	Rs 900	1100
Super Deluxe AC	Rs 990	1200
VIP Deluxe AC	Rs1600	1600
Suite	Rs 3000	3000
Extra PAX (Non AC)	Rs 100	-
Extra PAX (AC)	Rs 200	-

NB tax As per Applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

বিজ্ঞাপনের অফার নয়
বস্ত্র শিল্পে স্বাভাবিক মূল্য হ্রাসের জন্য
বেনারসী ~ সিল্ক
কাতান ~ ইক্কত
বালুচরী ~ জারদৌসি
কাঞ্জীভরম ~ সুতি
তাঁতের শাড়ি এবং
পাঞ্জাবী ~ শেরওয়ানি
ড্রেস মেটিরিয়াল
সুটিং-শার্টিং ও অন্যান্য
বস্ত্রের বিপুল ও
আকর্ষণীয় সম্ভার।
৬৮ বছরের ঐতিহ্য, সততা আর আপনার শুভেচ্ছা আমাদের সম্পদ। বদলাতে থাকা সময় আর পছন্দের সাথে ঐতিহ্যকে সঙ্গী করে বিশ্বস্তের মত আপনার সাথে এগিয়ে চলেছি আমরাও। আপনাকে আনন্দ অনুষ্ঠানে রঙিন সাজে সাজিয়ে তুলতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।
সময়ের সাথে বস্ত্র শিল্পে স্বাভাবিক মূল্য হ্রাসের সুবিধে সততার সাথে ভাগ করে নিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনও অফারের ধামাকা নয়, মূল্য হ্রাসের জন্য এখন শাড়ি কাপড় স্বাভাবিক কম মূল্যে।
শাড়ি কাপড়
এখন
আগের
দামে
ব্রহ্মচারী কালীবাড়ি
কোচবিহার
Call 03582 228563
সততার সাথে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন
লক্ষ্মী নারায়ণ বস্ত্রালয়

‘পোচার’ আরও অনেক বাড়াতে হবে!

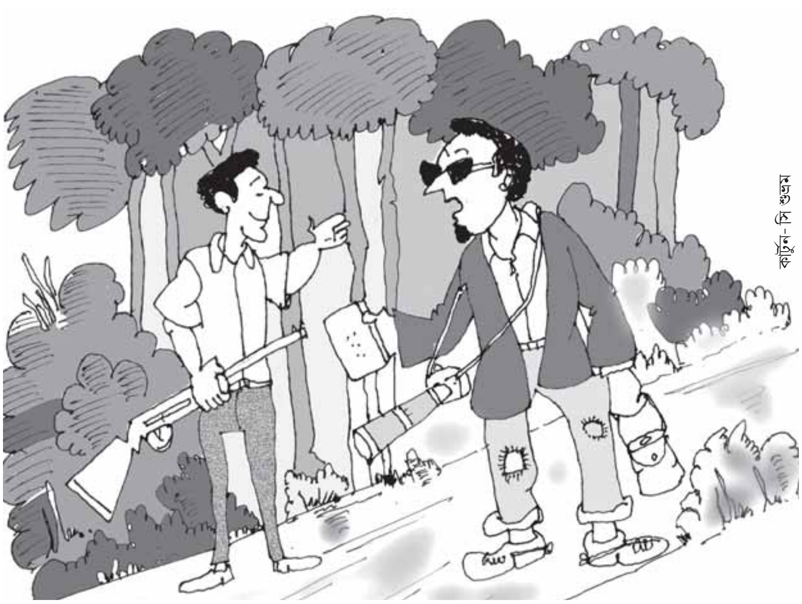

ওসব গম্মেন্টের গাইড কিস্যু জানে না। হাতি-গন্ডার দেখতে হলে আমাদের পোচার সমিতির অফিসে আসুন।

বনকর্তারা ইদানীং নতুন বুদ্ধি বের করেছেন। গন্ডার বা হাতি মরার খবর পেলেই সবাই মিলে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ছেন; ফলে তাদের মোবাইল বলছে হয় সুইচ অফ নতুবা নেটওয়ার্কের বাইরে। অন্তত কিছুটা সময় তো মিডিয়ার বিরক্তিকর কল থেকে রেহাই মিলছে। তারপর অবশ্য ধরা পড়লেই হাত তুলে দিচ্ছেন, ‘আমাদের লোকবল ভীষণ কম ভাই। আমরা নিরুপায়।’

এমপি’দের নাগাল পাওয়া ভার, তাঁরা তো এখন দিল্লিতেই বসবাস শুরু করেছেন। অতএব ধরো এমএলএ’কে। তিনি অন করে দিচ্ছেন পুরোনো রেকর্ড— খুব দুর্ভাগ্যজনক। এসব মেনে নেওয়া যায় না... শীঘ্রই তদন্ত শুরু হবে।... ইত্যাদি।

বেচারা বনমন্ত্রী অসহায়, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, কী বলবেন বা কী করবেন ঠাহর করে উঠতে পারছেন না। যদিও তিনি বিলক্ষণ জানেন, মিডিয়ার ঘ্যানঘ্যানানি ব্যস কয়েকটা দিনের জন্য সহ্য করতে হবে, তারপর সব আবার শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু এবার যে দেখছি থামবার লক্ষণ নেই, একের পর এক মেরেই চলেছে! চলতি আর্থিক বছরের পাঁচ মাস পেরোয়নি, অথচ সাত-সাতটি গন্ডার মেরে খড়্গ লুঠ হয়ে গেল! এই স্পিডে চললে তো দু’বছরেই জলদাপাড়ার সব গন্ডার নিকেশ হয়ে যাবে! সেই ১৯৮০ সালের মতো করুণ অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে, যখন গন্ডারের সংখ্যা সাকুল্যে ১৪’তে দাঁড়িয়েছিল! ছোটবেলায় তিনি বইয়ে পড়েছিলেন, মারিত গন্ডার যেন লুঠিত ভান্ডার। অথচ এতো দেখছি ব্যাটারা আরশোলার মতোই পটাপট মারছে। মহা মুশকিল! মন্ত্রীমশাইয়ের অস্বস্তি সত্যিই আন্তরিকভাবে অনুভব করা যায়।

তবে মন্ত্রীমশাই সম্ভবত এও জানেন বক্সা টাইগার রিজার্ভের মতোই জলদাপাড়ায় চোরাশিকারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল হাত বাড়ালেই ভুটান বর্ডার। যে বর্ডারে গাড়িঘোড়া তল্লাশির কোনও ব্যবস্থা নেই। একবার ঢুকে পড়তে পারলেই হল, তারপর নিরাপদ করিডর ধরে সোজা চিন। মন্ত্রীমশাইয়ের নিশ্চয়ই জানা আছে বছর কয়েক আগে যখন মানসের জঙ্গলে এভাবে কাতারে গন্ডার নিধন চলত সে সময় ব্যাংককে ধরা পড়েছিল একসঙ্গে ষোলো খানা গন্ডার শৃঙ্গ, সেইসঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল এই চোরাশিকারে ভুটান রাজপরিবারের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের জড়িয়ে থাকার অবাক তথ্য।

ভিন রাজ্যের বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের অভিমত কিন্তু ঘুরেফিরে একটাই—পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণ দপ্তরের সংরক্ষণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্তাদের সংখ্যা সত্যিই অতি কম, পোচিং-এর মতো কঠিন সমস্যার সমাধান করা এদের কম্মো নয়। কারণ পোচিং-এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দারিদ্র্য, সীমান্তে অবাধ অনুপ্রবেশ, দপ্তরের ক্রনিক দুর্নীতির মতো বৃহত্তর দুরারোগ্য ব্যাধি। আর যে রাজ্যে এমএলএ’র নাম চন্দন কাঠ চোরাপাচারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়— সেখানে হতভাগ্য গন্ডার হাতির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যেমন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিটকর্মীর প্রশ্ন, চোরাশিকারির দাপটে এরপর জলদাপাড়ার গন্ডার যদি একটাও না থাকে তবে ডিপার্টমেন্টের কি কোনও অসুবিধা হবে? কর্তাদের কি কোথাও এক টাকাও মাইনে কমবে? বরং দেখবেন উল্টোটাই হচ্ছে— তাদের আরও সমৃদ্ধি হয়েছে।

পাশের রাজ্য আসামের কাজিরাঙ্গাতেও গন্ডার পোচিং-এর সমস্যা ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ সেখানে গন্ডার মেলে শয়ে শয়ে, হাজারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক সময় গন্ডার ঢুকে পড়ে লোকালয়ে, মানুষ গন্ডার সংঘাত সেখানকার নৈমিত্তিক ঘটনা। সেখানেও বনদপ্তরের ভেতরকার অসাধু কর্মীদের দিয়ে খড়্গ শিকার হয়, যা প্রশাসনের অজানা নয় মোটেই। কিন্তু সেখানে বনপ্রশাসনকে ক্রমাগত সজাগ রেখে দেয় সংরক্ষণবাদী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। গত বছরই গোড়ার দিকে একবার গন্ডার হনন রোধের উপায় হিসেবে আসামের সরকার যখন সব গন্ডারের খড়্গ কেটে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন বিক্ষোভে

প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল এইসব সংস্থা। এতো ভাবের ঘরে চুরি নয়, ডাকাতি— তাদের ক্রমাগত চাপে শেষপর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল বনমন্ত্রক। এসব সংস্থার সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক খুব খারাপ হলেও এদের কাজকর্মে কখনও বাধা সৃষ্টি হয় না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ রাজ্যে ওই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি সংরক্ষণের চাইতে ফোটোগ্রাফি বা টুরিজম প্রসারে বেশি মনোযোগী, পোচিং রোধ করার উদ্যোগ নিতে তাদের কখনও দেখা যায় না। তবে বনদপ্তর বা প্রশাসন এই সাধু উদ্যোগে এই ধরনের সংস্থাকে যে কখনই সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে না তা বলাই বাহুল্য। বরং কারও ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত লাগলে সরকারি হস্তক্ষেপও ঘটবে দ্রুত। খবরের কাগজে অভিযোগের তীর ছোটে হয়ে যায়। গন্ডার বা হাতির পাশাপাশি ডুয়ার্সের জঙ্গলে সেইসব পশু-পাখি যে চোরাশিকার হচ্ছে না সেটাও কি বনমন্ত্রী বা বন্যপ্রাণ বিভাগ বুক বাজিয়ে বলতে পারবেন?

পোচিং রোধ নিয়ে দেশের নানা প্রান্তে যাঁরা কাজকর্ম করছেন তাঁদের মতে আজকের আর্থিক ও সামাজিক পরিকাঠামোয় পোচিং বোধহয় সহজতম কাজ, যেরকম কঠিন এই পোচিং রোধ করার কাজটা। ইদানীং রাজ্যের বনমন্ত্রী এবং বননিগমের চেয়ারম্যানের পদ সংরক্ষিত থাকছে ডুয়ার্সের জন্য, অথচ ডুয়ার্সের বন্যপ্রাণ সবচাইতে কম সুরক্ষিত। ডুয়ার্সবাসী হিসেবে লজ্জার জায়গাটা এইখানেই।

ঘুরেফিরে আঙুল ওঠে কিন্তু সেই রাজনীতির হর্তাকর্তাদের দিকেই। এরকমই

> গন্ডারের খড়্গ বা হাতির দাঁত চুরি হলে তার প্রমাণ হিসেবে পড়ে থাকছে তাদের বিশাল মৃতদেহ। কিন্তু খড়্গ বা দাঁত ছাড়াও লেপার্ড ক্যাট চিতল হরিণ বা প্যাঙ্গোলিনের মতো ছোট সাইজের পশু পোচিং হলে তার তো কোনও প্রমাণই থাকে না, সবটাই পাচার হয়ে যায়। গন্ডার বা হাতির পাশাপাশি ডুয়ার্সের জঙ্গলে সেইসব পশু-পাখি যে চোরাশিকার হচ্ছে না সেটাও কি বনমন্ত্রী বা বন্যপ্রাণ বিভাগ বুক বাজিয়ে বলতে পারবেন?

সরাসরি নীচুতলার বনকর্মীদের দিকে, কিংবা বনসংলগ্ন গ্রামবাসীদের দিকে, কারণ তাদের আস্কারা না পেলে চোরাশিকারিরা জঙ্গলেই ঢুকতে পারে না। অথচ আসল সত্য হল বজ্র আঁটুনি ফস্কাগেরো। পাহারাদারি থাকে মূল ফটকে, অন্যত্র অবাধে ঢুকে পড়া যায় জঙ্গলে। এ অভিযোগ সংলগ্ন গ্রামবাসীদেরই। আর বনকর্মীদের অভিযোগ আরও মারাত্মক, বক্সা জলদাপাড়ায় পোচিং ছিল আছে থাকবে। হাতি বা গন্ডার বলেই হইচই বেশি। সত্যিই তো, গন্ডারের খড়্গ বা হাতির দাঁত চুরি হলে তার প্রমাণ হিসেবে পড়ে থাকছে তাদের বিশাল মৃতদেহ। কিন্তু খড়্গ বা দাঁত ছাড়াও লেপার্ড ক্যাট চিতল হরিণ বা প্যাঙ্গোলিনের মতো ছোট সাইজের পশু পোচিং হলে তার তো কোনও প্রমাণই থাকে না, সবটাই পাচার এক নেতার ছায়াসঙ্গী অবশ্য এর দাওয়াই বাতলে দিলেন বিন্দাস— 'দেখুন, দাদা বলেছেন আমাদের মানুষ নিয়ে কারবার। তাই দিন-রাত আমাদের মানুষ নিয়েই কেটে যায়, জন্তু জানোয়ার নিয়ে ভাবার সময় কোথায় বলুন! আর দাদা তো বলেই দিয়েছেন, কোথায় হাতির দাঁত চুরি গেল, কোথায় গন্ডারের পোঁদে গুলি করে শিং খুলে নিল, কোথায় বাইসনের বিচি কাটা পড়ল ওসব নিয়ে লড়াই করলে কি ভোট বাড়বে? সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের ওসব পোবলেম নিয়ে মাথা ভারি করার সময় আছে? আমি বরং বলব, আপনারাই পোচার বাড়াতে থাকুন, পোচার যত বাড়বে ততই মঙ্গল। হারামিগুলির দু'একটাকে ধরে দাঁত নখ উপড়ে দিলে বুঝবে কত ধানে কত চাল। তবে পোচার কিন্তু বন্ধ করা চলবে না...'

বৃক্ষ নিধন— পথ দেখাচ্ছে বালিয়ামারি

অগাস্ট ২০১৫ সংখ্যা 'এখন ডুয়ার্স'-এ 'বৃক্ষনিধন' নিয়ে ব্রজগোপাল ঘোষ-এর লেখা মর্মস্পর্শী চিঠিটি পাঠকমহলে সাড়া ফেলেছে। বেশ কিছু ফোন এসেছে ডুয়ার্স থেকে। তার মধ্যে মাথাভাঙার ঘটনাটি উল্লেখ্য। সুটকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়ামারি গ্রামের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে চ্যাংরাবান্ধা-কোচবিহার ১২এ রাজ্য সড়ক। সম্প্রতি সেই সড়ক চওড়া করার কাজ শুরু হওয়ায় কাটা পড়েছে দু'পাশের কয়েকশো গাছ। কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়েছে বালিয়ামারি গ্রামের মানুষ। গ্রামের হাইওয়ের ধারে একটি দেড়শো বছরের পুরনো গাছকে তারা কাটতে দিতে নারাজ।

কলেজের ছাত্র থেকে শুরু করে এলাকার কৃষিজীবি, ফেরিওয়ালা, দোকানদার কেউই চান না আজন্মের সাথী প্রাচীন বৃক্ষটিকে হারাতে। তাদের বক্তব্য, প্রখর গ্রীষ্মে এই গাছের ছায়ায় বসে ঘাম জুড়োয়, শীতে গাছের ডালে এসে বসে কত ধরনের পাখি। সেসবের মূল্য দেবে কে? তাই প্রয়োজনে 'তল্লী গাছ বাঁচাও কমিটি' গড়ে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রামবাসী। তাদের দাবি গাছ বাঁচাতে প্রয়োজনে রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়া হোক, তার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেদের জমি দিতেও প্রস্তুত তারা, কিন্তু এ গাছ কাটা চলবে না।

মাথাভাঙা থেকে এ খবর জানিয়েছেন বরুণ সাহা, প্রকাশিত হয়েছে স্থানীয় 'বৈশাখী' পত্রিকাতেও। বরুণের মতে, ব্রজগোপাল ঘোষের চিঠির অনুসরণে বালিয়ামারির ছোট্ট প্রতিবাদ ডুয়ার্সের মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাবে উন্নয়নের বন্ধ চোখকে মাঝে মাঝে খুলে দেওয়ার জন্য।

www.greentearesort.com
গরুমারা বেড়াতে যাওয়ার নতুন ঠিকানা
Nature Stay
Green Tea Resort
Batabari (Near of Batabari Tea Garden, Murti More) Jalpaiguri, Dooars
Resort Contact no. : +91 98749 26156
Kolkata Office - 112, Kalicharan Ghosh Road, Near Baishakhi Sweets, Kolkata- 700050
Kolkata Cont.no - +91 98310 64916, +91 92316 77783
e-mail : greentearesort@gmail.com

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR
HOTEL GREEN VIEW
Suit AC, Super Delux, AC, Non AC , Conference Hall
HOTEL Green View
Food & Lodging
Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (O), 9434756733 (M)

কাল কে নেতা বাংলার পাহাড়ে ?

বাংলার হিমালয়ে ঘিসিং-এর পথ অনুসরণ করেই হুহু করে নামছে বিমল গুরুং-এর জনপ্রিয়তা— পাহাড়বাসীর আজ এ তথ্য অজানা নয়। এই সুযোগেই গুরুং বিরোধী কার্যকলাপ শুরু হয়ে গিয়েছে সংগোপনে। সবার মনেই প্রশ্ন, এরপর কে হতে যাচ্ছে দার্জিলিং হিল সুপ্রিমো? যার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে ডুয়ার্সে বসেই।

রং পালটাচ্ছে, বাংলার পাহাড়ের রাজনৈতিক চালচিত্র পালটে যাচ্ছে, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। দাড়াগাঁও বা শেরফু তিস্তার এ পাশে রঙ্গু বা তোদে সব পাহাড়ি জনপদে এখন একটাই স্লোগান 'বিমল গুরুং দূর হটো।' এক পাহাড়ি গ্রাম থেকে আর এক পাহাড়ি গ্রামে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে বিমল-বিরোধী ওই শ্লোগান। যদিও বিমল বাহিনীর ভয়ে সরাসরি কেউ মুখ খুলতে রাজি নয়। কিন্তু ওই শ্লোগান এখন বাংলার পাহাড়ে ওপেন সিক্রেট। রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে পাওয়া পাহাড়ি এই খবরে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। বিমল গুরুং নিজেও জানেন, কমেছে তাঁর জনপ্রিয়তা। কমেছে জনবল। তিনিও জানেন যে তাঁকে সরতে হবে, গদিও ছাড়তে হবে, আজ নয় তো কাল। আর পাহাড় জুড়ে এখন একটাই প্রশ্ন। কাল কে নেতা বাংলার পাহাড়ে?

সুভাষ ঘিসিং জানতেন। বিমল গুরুং-ও জানেন। গোর্খাল্যান্ড কেবলমাত্র একটি স্বপ্ন। যা কোনও দিন বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। তবু এই স্বপ্নকে বারবার নতুন মোড়কে এনে রাজনীতি করেছেন সুভাষ ঘিসিং, বিমল গুরুং ও আরও অনেকে। বাংলার পাহাড়ের সহজ সরল মানুষগুলোর আবেগ নিয়ে বারবার খেলছেন বিমলরা। মঞ্চ একটাই। আর সে মঞ্চের রং বারবার বদল হয়েছে। কখনও রতনলাল ব্রাহ্মণ, কখনও সুভাষ ঘিসিং, কখনও বিমল গুরুংরা স্বপ্ন দেখিয়ে নেতা হয়েছেন পাহাড়ে। আটের দশকের শুরুতে সুভাষ ঘিসিং-এর নেতৃত্বে আলাদা রাজ্যের আন্দোলনে রক্তে ভিজেছিল বাংলার পাহাড়। কিন্তু তারপর! কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে সুভাষ ঘিসিংই তৎকালীন বাম শাসিত রাজ্য সরকারের চকোলেট বয় হয়েছিলেন। সেই সুভাষ ঘিসিং-এর দেখানো পথেই হেঁটেছেন বিমল গুরুং। বলা যায় গুরুং ঘিসিঙের চেয়েও কয়েক ধাপ এগিয়ে। কথায় কথায় পাহাড় বন্ধ ও রাস্তা অবরোধ করে জনজীবন স্তব্ধ করে দেওয়াই ছিল বিমল গুরুং-এর আন্দোলনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। দিনের পর দিন

ঘিসিং-এর নেতৃত্বে আলাদা রাজ্যের আন্দোলনে রক্তে ভিজেছিল বাংলার পাহাড়। কিন্তু তারপর! কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে সুভাষ ঘিসিংই তৎকালীন বাম শাসিত রাজ্য সরকারের চকোলেট বয় হয়েছিলেন। সেই সুভাষ ঘিসিং-এর দেখানো পথেই হেঁটেছেন বিমল গুরুং।

বন্ধের রাজনীতি ও অবরোধ বাংলার পাহাড়ের মানুষগুলো সহ্য করেছিল মুখ বুঁজে। কারণ, গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন দেখিয়েছিল বিমল গুরুং। গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সময়ও বেঁধে দিয়েছিলেন বিমল। শুধু তাই বা বলি কেন, চৌরাস্তার মঞ্চে দাঁড়িয়ে একথাও তো ঘোষণা করেছিলেন বিমল, যদি গোর্খাল্যান্ড নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়িত না হয় তবে তিনি আত্মহত্যা করবেন। বিমলের এমন মরণপণ অঙ্গীকার শুনেই হয়ত পাহাড়বাসীর হৃদয় ভিজেছিল! ঘিসিং-গুরুং-দের সন্ত্রাসমূলক আন্দোলন মুখ বুঁজে মেনে নেওয়া ছাড়া সাধারণ মানুষের অন্য পথ কী। তবে সময় তার নিজের মতোই চলে গিয়েছে। যেমন চলে গিয়েছে মেচি বা তিস্তা দিয়ে কয়েক হাজার কিউসেক জল।

গোর্খাল্যান্ড হয়নি। তবে আবার কিন্তু সেই বিমল গুরুং মঞ্চে দাঁড়িয়ে ব্রিফকেস থেকে পিস্তল বের করে আত্মহত্যা করতে যাবার এক রুদ্ধশ্বাস নাটক করেছেন। ২০১১ সালে রাজ্য-রাজনীতির পট বদলেছে। পরিবর্তনের পর, সেই বিমল কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে এখন বর্তমান রাজ্য সরকারের লালিপপ বয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিমল গুরুং-এর সর্ম্পকের মাঝে বিশ্বাসযোগ্যতার কোনও জায়গা নেই। ফাঁকটাই বারবার তার প্রমাণ রেখেছে। স্বার্থপ্রণোদিত সম্পর্কে এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই সংঘাত প্রকাশ্যে তো বটেই ভিতরে ভিতরে রয়েই গিয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বিমল বা তার দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বা গজমম-এর জনপ্রিয়তা কমেছে পাহাড়ে। তা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন বিমল নিজে। পাহাড়ের মানুষ তাঁকে আর পছন্দ করছেন না। এক সময়ের পাহাড়ের সব বাড়িতে দেয়ালে টাঙানো থাকত সুভাষ ঘিসিং-এর ছবি। যা প্রায় রাতারাতি দখল করেছিল বিমল গুরুং। ঘিসিং-এর ছবি উধাও হয়ে জায়গা নিয়েছিল বিমলের ছবি। কিন্তু সব বাড়িতে এখন আর বিমলের ছবি চোখে পড়ে না।

এক সময় বিমল ও তার দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার চাপে পাহাড় ছাড়তে হয়েছিল সুভাষ ঘিসিংকে। বাংলার পাহাড়ের একদা মুকুটহীন সম্রাট সুভাষ ঘিসিং নিজের স্ত্রীর মৃতদেহ নিয়ে পাহাড়ে উঠতে পারেননি। পাহাড় ছেড়ে তাঁকে বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরে। কিন্তু সুভাষ

ঘিসিং-এর মৃত্যুর পর থেকে পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করেছে। জনবল ও জনপ্রিয়তা দুই হারাচ্ছে বিমল-বাহিনী। পাহাড়ের সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করেছে বিমল তথা গজমম নেতাদের জীবনযাত্রা নিয়ে। তাদের সম্পত্তির হিসেব নিয়ে। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে বিশেষ পোস্টার ও লিফলেট, যাতে লেখা 'বিমল তিমি দূর হাটো'। লিফলেটে আছে তার জীবনযাত্রা ও সম্পত্তির হিসেবনিকেশ। যে কোনও দিন নেপালি ভাষায় লেখা এই পোস্টার পড়বে বাংলার পাহাড়ে। ছড়িয়ে যাবে লিফলেট পাহাড়ের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ডুয়ার্সে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পাহাড়ের রাজনীতিতে গুরুং-এর উঠে আসার গল্পটাও বেশ নাটকীয়। প্রশান্ত তামাং ইন্ডিয়ান আইডল হবার পর এফ.এম-এ 'চৌকিদার বন গ্যায়া আইডল' উক্তিতে ঝড় ওঠে পাহাড় জুড়ে। পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে রেড এফ.এম'কে ধিক্কার জানিয়েছিল গোটা বাংলার শিক্ষিত সমাজ। সে সময় পাহাড়ের মানুষকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় বিমল ও এক ঝাঁক পাহাড়ি চেনা বা অচেনা নানা মুখকে। উঠে আসে রোশন গিরি, অমল আলে, অমর লামা, হরকা বাহাদুর ছেত্রী সহ আরও অনেকের মুখ। এদের প্রায় সকলেরই পুরনো রাজনৈতিক পরিচিতি থাকলে, তা ছিল পাহাড় বন্দি। ২০০৭ থেকে আলাদা রাজ্যের আন্দোলনে এদের নতুন পরিচিতি হয়। ওরা আত্মপ্রকাশ করে পাহাড়ের নতুন রাজনৈতিক দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নামে। সরাসরি বিরোধিতা করে পাহাড়ের চেনা-জানা প্রতিদিনের প্রথাগুলোকে। সমর্থনও মিলে যায়। কারণ, সে সময় বাংলার পাহাড়ের মুকুটহীন সম্রাট সুভাষ ঘিসিং-এর জনসংযোগ বলতে কিছু ছিল না। যা কার্যত কাজে লাগায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। প্রচুর জনসমর্থন নিয়েই তাদের আন্দোলন। তাদের বিক্ষোভ শুধুমাত্র পাহাড়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার পাহাড় বেয়ে বিক্ষোভের আঁচ নেমে আসে সমতলে, ডুয়ার্সে। তাদের তৈরি প্রস্তাবিত গোর্খাল্যান্ডের ম্যাপে বাংলার পাহাড় ছাড়াও ডুয়ার্স তরাইকেও রাখা হয়। কিন্তু আলাদা রাজ্যের বিরোধিতার প্রথম সুর ওঠে ডুয়ার্স থেকে। বন্ধ, পালটা বন্ধ, সংঘর্ষ, চা-পাতায় রক্তের দাগ, বারুদের গন্ধ, ভারী বুটের আওয়াজ সব কিছুরই সাক্ষী হয় চিরশান্ত ডুয়ার্স। তারপর সময়ের সঙ্গে থিতিয়ে গিয়েছে অনেক কিছু।

এদিকে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বাংলার পাহাড়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ওয়াকিবহাল রাজ্য সরকার। আর শাসক তৃণমূল বাংলার পাহাড়ের রাজনৈতিক চালক হতে মরিয়া। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেবকে দিয়ে বাংলার পাহাড়ে তৃণমূলকে শক্তিশালী করা যাবে। কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি। তিনি বুঝে গিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর তকমা বাদ দিয়ে ব্যক্তি গৌতম দেবকে মানুষ পছন্দ করে না। সমতলে ও পাহাড়ে ব্যক্তি গৌতম দেবের জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকেছে। এদিকে সামনে বিধানসভার ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। তাই গৌতম দেবকে পাহাড়ের রাজনীতি থেকে সরাসরি না সরিয়ে তার সঙ্গে যৌথ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আর এক মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। একথা বলাই বাহুল্য বাংলার পাহাড়ের রাজনীতি সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিবহাল নয় ফারাক্কার ওপারের জনপ্রতিনিধি অরূপ বিশ্বাস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, পাহাড় আর সমতলের রাজনীতি একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, শুধুমাত্র অরূপ বিশ্বাসকে পাহাড়ের দায়িত্ব দিয়ে তিনি গৌতম দেবকে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর কাজে তিনি খুশি নন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে খোদ গৌতম দেবের বিধানসভা এলাকায় লজ্জাজনক ফলাফল। লোকসভা ভোটে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি থেকে তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। এবং তারপর শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন বামেদের দখলে চলে যাওয়াতে গৌতম দেব প্রমাণ করেছেন সাধারণ মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই। এসব নিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গৌতম দেবের উপর যথেষ্ট বিরক্ত। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভোট সামনে, তার ফলাফল যদি তৃণমূলের খারাপ হয় তাহলে গৌতম দেবের মন্ত্রীত্বও চলে যেতে পারে বলে খোদ তৃণমূল ভবনের খবর। গৌতম দেব'কে ছেড়ে তৃণমূল এখন পাহাড়ে নতুন নেতা খুঁজছে। সুভাষ ঘিসিং-এর এক সময়ের ছায়াসঙ্গী রাজেন মুখিয়াকে পাহাড়ে তৃণমূলের সহ-সভাপতি করে আপাতত পায়ের তলায় শক্ত জমি তৈরি করতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস।

যদিও পাহাড়ে রাজেন মুখিয়ার কতটা গ্রহণযোগ্যতা আছে তা নিয়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরেই প্রচুর প্রশ্ন। কারণ, রাজেন মুখিয়া পাহাড়ি মানুষ হলেও তিনি থাকেন সমতল ঘেঁষে। আবার সে গৌতম দেবের কাছের মানুষ বলেও পরিচিত। আর গৌতম দেব নামটাই পাহাড়ি মানুষের অপছন্দ। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়াকে দাঁড় করিয়ে ছিল তৃণমূল। কিন্তু বাইচুং-এর ভাগ্যে শিকে ছেড়েনি। পরে বাইচুংকে সামনে রেখে পাহাড়ে তৃণমূল পাহাড়ি রাজনীতি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সিকিমের বাইচুং বল পায়ে যতটা স্বচ্ছন্দ ততটা বাংলার পাহাড়ি রাজনীতিতে নয়। বাইচুং ভুটিয়াকে দিয়ে রাজনীতি হবে না তা বুঝে গিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। কালীঘাটের গোপন খবর, কালিম্পঙের বিধায়ক ড. হরকা বাহাদুর ছেত্রীকে তৃণমূলে চাইছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাকে আগামী দিনে বাংলার পাহাড়ের নেতা করতে চান তিনি। বিজেপি চাইছে সাংসদ এস এস আলুওয়ালিয়াকে সামনে রেখে দলীয় শক্তি বাড়াতে। কিন্তু পাহাড়ে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আদৌ তিনি সফল হবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এখন একটাই প্রশ্ন। বিমল বা তার বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করছে কে বা কারা? না, ওরা এখনই সামনে আসতে রাজি নয়। ওদের দাবি শুধু আলাদা রাজ্য নয়, দাবি ঘিসিং-এর ষষ্ঠ তপশিলি এবং তিব্বতি-সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে একটি স্বাধীন মঞ্চ। বলা যায় একেবারে নতুন মোড়কে পুরনো মদ। ওদের দাবি, ষষ্ঠ তপশিলি ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাধীন সত্তা আমূল পরিবর্তন আনবে পাহাড়ে। কে যোগাচ্ছে এইসব দাবির ভাষা, কে সংগঠিত করছে ওদের? আর যে পাহাড়ের মানুষগুলোকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শেখাচ্ছে, সে কে? সে কি বিমল গুরুংকে সরিয়ে হতে চাইছে পাহাড়ের মুকুটহীন সম্রাট! আগামী দিনে বাংলার পাহাড়ের নেতা তাহলে কে? উত্তরের জন্য আমরা সময়ের কাছেই হাজির থাকব।

দেব সমুদ্র

এদিকে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বাংলার পাহাড়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ওয়াকিবহাল রাজ্য সরকার। আর শাসক তৃণমূল বাংলার পাহাড়ের রাজনৈতিক চালক হতে মরিয়া। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেবকে দিয়ে বাংলার পাহাড়ে তৃণমূলকে শক্তিশালী করা যাবে। কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি।

দেশ জুড়ে জাল নোট ছড়াবার হেড কোয়ার্টার এখন মালদায়

ফজলি-ল্যাংড়া আমের মতোই মালদার এখন দেশ জোড়া খ্যাতি জাল নোটের সাপ্লাই ও সার্কুলেশনের জন্য। গত আর্থিক বছরে দেশজুড়ে আনুমানিক দেড় হাজার কোটি টাকার জাল নোট সাপ্লাই হয়েছে এই মালদহ থেকে। যা নাকি দেশের জালনোট বাণিজ্যের ৯৫ শতাংশ। ভাবা যায়? গৌড়বঙ্গের ইতিহাস সমৃদ্ধ মালদহ, গনি খান চৌধুরির মালদা তার কৌলীন্য হারিয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যায় হামেশাই। মালদা শহরের পরিচ্ছন্নতা আর আগের মতো নেই বলেও রব ওঠে আজকাল। কিন্তু সবার চোখের আড়ালে গোকুলে বেড়ে উঠেছে মুম্বই-দুবাই-এর ভাইদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো 'ডন' এই মালদাতেই। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার রাতের ঘুম রীতিমতো কেড়ে নিয়েছে সেইসব ডন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। ধরপাকড় হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। অন্তত সেরকমই গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ।

কিন্তু দেশের এত তাবড় তাবড় জায়গা থাকতে নিরীহ মালদা কেন? খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে এই প্রশ্ন। আর যে কোনও স্থানের বাণিজ্যিক বিকাশের প্রধান কারণগুলির মতোই তার উত্তর দেওয়াও কঠিন কিছু নয়। যেমন বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত মালদা থেকে সারা দেশের রেল যোগাযোগ এক কথায় অতুলনীয়। কলকাতার দুঁদে গোয়েন্দাদের 'কলা' দেখিয়ে এখান থেকেই সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় বিহার-উত্তরপ্রদেশ তথা সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারত। আর ডুয়ার্সের প্রান্তিক জেলাগুলির প্রতি গোয়েন্দাদের ফোকাস বেশি, সেইসঙ্গে পাহাড়ে ক্রমাগত অশান্তির আবহাওয়া, সব মিলিয়ে মালদা-দিনাজপুর সীমান্তে নজর অপেক্ষাকৃত কম। সেই সুযোগেই প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে বান্ডিল বান্ডিল জাল নোট ঢুকে পড়ে এই বাংলায়। গোয়েন্দারা নাকি প্রমাণ পেয়েছেন সেই সব নোট ছাপা হয় আসলে কোনও উন্নতমানের নোট ছাপাবার প্রেসে। পাকিস্তান সীমান্তে কড়াকড়ি থাকায় এই ছাপা নোট চলে আসে বাংলাদেশে।

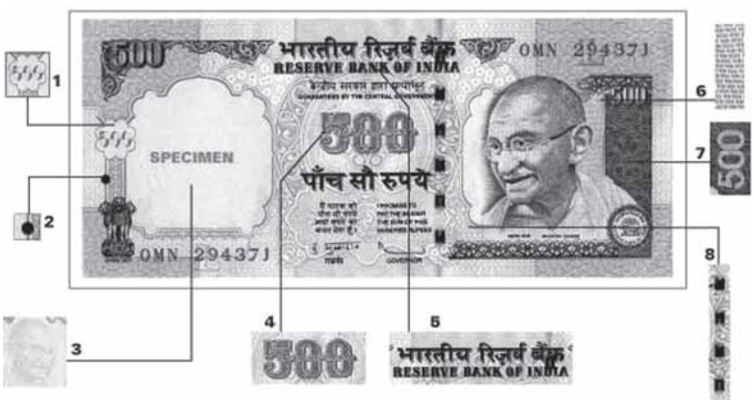

কাজের অভাবে ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের তরুণ বয়সিদের একটা বড় অংশ চলে যায় অন্যান্য রাজ্যে মজুরি খাটতে। মালদাতেও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। টানা কয়েক মাস কাজ করে রোজগার নিয়ে তারা ঘরে ফিরে আসে কিছুদিনের জন্য। আবার বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। বাংলাদেশ থেকে আসা জালনোট সারা দেশে পৌঁছায় এইসব ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া অল্পবয়সি তরুণ মজুর সম্প্রদায়ের হাত দিয়ে। অনেকেই বেশি রোজগারের লোভে পাচারকারীদের জালে পা বাড়ায়। খেটে রোজগার করে আনা অর্থের বড় অংশ দিয়ে কিনে নেয় জাল নোট। গোয়েন্দারাই খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, মালদার হাজার টাকার জাল নোট বিক্রি হয় ১০০ থেকে ২০০ টাকা দরে, যা অন্য রাজ্যের নির্দিষ্ট ক্রেতার কাছে নিয়ে যেতে পারলে পাওয়া যায় ২০০-৩০০ টাকা।

গোয়েন্দারা বলেন, মাথাপিছু ২-৩ লক্ষ টাকার জাল নোট নিয়ে এরা পৌঁছে যায় মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো বড় শহরে। মজুর খাটার পাশাপাশি এই চটজলদি উপরি রোজগারের আকাঙ্খা দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে জাল নোট। কেবল হাজার টাকারই নয়, পাঁচশো এমনকি পঞ্চাশ-একশোর নোটও ছড়াচ্ছে দেদার, কারণ ছোট নোটে পুলিশের নজর কম থাকে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের তল্লাশি চলছে জোরকদমে বলাই বাহুল্য, কিন্তু তার মধ্যেই পাল্লা দিয়ে নেটওয়ার্ক চালাচ্ছে চোরাকারবারিরা। সবার অলক্ষ্যে বলিউডি ক্রাইম থ্রিলারের জীবন্ত পটভূমি হয়ে উঠছে মালদহ।

সুজয় ঘটক

দুই বাংলার ঐক্য জমে চোরাপাচারে

বছর দশেক আগে বদলির চাকুরিতে কিছুদিনের জন্য বালুরঘাটে কাটাতে হয়েছিল এক বন্ধুকে। তার কাছে গল্প শুনেছিলাম, বালুরঘাট-বাংলাদেশ হিলি সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানরা পোস্টিং পেলে নাকি বর্তে যায়। যে ক'টা দিন থাকে দু'হাতে উপরি রোজগার চলে অঢেল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে অতটা ক্যাশ টাকা সঙ্গে রাখা বিপদ, তাই তারা বালুরঘাটে শহরের নানা জুয়েলারিতে এসে নাকি মোটাসোটা সোনার চেন বানিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়ে যায়। আর বলাই বাহুল্য তাদের সেই উপরি রোজগারের উৎস সীমান্তের অবাধ চোরাপাচার।

বন্ধুর সেই গল্পের সত্যতা যাচাই করে দেখার সুযোগ হয়নি, কিংবা গত এক দশকে সীমান্ত রক্ষীদের আচরণেও পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানা নেই। কিন্তু বালুরঘাট-হিলি সীমান্ত দিয়ে চোরাপাচারের পরিমাণ যে কমেনি তা খবরের কাগজের পাতা উল্টেই টের পাই। বর্ষার জলে থইথই নদী পারাপার যখন দুঃসাধ্য তখন নাকি অন্ধকার নামলেই পালে পালে গরু আর তাদের ল্যাজ ধরে পাচারকারীরা নেমে পড়ছে নদীতে। গরুর সঙ্গে সাঁতরে পেরিয়ে যাচ্ছে সীমান্ত। আর পারে দাঁড়িয়ে নাকি অবাক বিস্ময়ে এই অভিনব চোরাপাচার প্রত্যক্ষ (নাকি উপভোগ) করছে বিএসএফ জওয়ানরা।

ওপারের বিডিআর জওয়ানরা পাচারকারীদের জন্য হাতে শুকনো গামছা-তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করে কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে দুই বাংলার এই ভালবাসায় সত্যিই মুগ্ধ হতে হয় বইকি!

সুলতান চৌধুরী

পাট চাষে নতুন বাধা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুত হারে চাহিদার কাঁটা নেমে যাওয়ায় বিপন্ন হয়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গের পাটচাষিরা, একের পর এক বন্ধ হয়ে গিয়েছে পাটকল। সিন্থেটিক দুনিয়ায় যাওবা হেরিটেজ কদর পাচ্ছিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সে আশাতেও জল ঢেলে দেয়। তবুও বর্ষায় পাট চাষকে বেছে নেয় নিরুপায় চাষি, যেটুকু জোটে সেটুকুই বা কোত্থেকে আসবে। হাতির অরুচি পাট, তাই নিরাপদে গাছ দৈর্ঘ্যে বাড়ে। তারপর প্রয়োজন জলাশয় সেই গাছ পচিয়ে আঁশ বের করার জন্য। কিন্তু সেখানেও বাধ সাধছে জলাভূমির অভাব। নেপাল-বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ রীতিমতো জনবিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গ জুড়ে। মানুষের ঠাঁই গোজার জন্য বাড়িঘর বাড়ছে, গ্রাম বিস্তৃত হতে হতে পৌঁছে যাচ্ছে শহরের কাছে। দ্রুত ভরাট হচ্ছে জলাভূমি, বিঘ্নিত হচ্ছে পরিবেশ, আর তার সঙ্গে বিপদে পড়ছে দরিদ্র পাটচাষিরা। পাট ভেজাবার জলাশয় ক্রমশ কমছে। যদিও আধুনিক পদ্ধতিতে পাটের আঁশ ছাড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু চাষির যেন সাবেক প্রথাতেই ভরসা বেশি। এ ছবি আজ দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি- কোচবিহার সর্বত্রই একই রকম। কৃষিদপ্তর থেকে এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলে নতুন পদ্ধতি নিয়ে চাষিকে সহায়তা করলে সমস্যার খানিকটা সুরাহা হত বলেই মনে হয়।

সুরঞ্জন প্রামাণিক

বন্যায় বিপন্ন লোয়ার আসাম, আশ্চর্য নীরব ভূমিকা মিডিয়ার

উপরের ছবিটি দেখে যদি কারও চোখে জল আসে তবে তা মুছে ফেলুন, কারণ এই কান্নায় দিল্লি বা মুম্বইয়ের ন্যাশনাল মিডিয়ার মন ভেজে না, কারণ এইসব বন্যার্ত গৃহহীন মানুষের দুঃখ সেভাবে বাজারে বিক্রি হয় না, যেভাবে মুম্বইয়ের জল জমে যাওয়া পথঘাটের ছবি প্রচারিত হলে চ্যানেলের টিআরপি চড়চড় করে বাড়ে। সেভাবে এখানকার বন্যার ছবি দেখলে দর্শক-পাঠকের হৃদয় গলে না। কারণ, এটি দেশের উত্তর-পূর্বের একটি অখ্যাত এলাকা, যেখানে দারিদ্র্য, জাতি দাঙ্গা, হিংসা, নরহত্যায় জীবন বিপর্যস্ত হয়ে থাকে বছরভর, সেখানকার ছবি সুদূর দিল্লি বা মুম্বইয়ের ক্যামেরার টেলিলেন্সে আসে না। অগাস্টের মাঝামাঝি থেকে অঝোর বর্ষন মানস, আইনদীর জল বিপদসীমার উপর তুলে দিয়েছে রাতারাতি, হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝাড়, চিরাং জেলার গ্রামের পর গ্রাম। আসামের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর যুঝে উঠতে পারছে না, এই আচমকা বিপর্যয়ের সঙ্গে সীমিত ত্রাণ আসছে দেরিতে। আক্ষেপের বিষয় দেশের নজর ঘোরাতে পারত যে মিডিয়া তাদের নজর নেই এই দিকে, তাই সরকার বা প্রশাসনও সেভাবে নড়েচড়ে বসেনি। আদৌ কোনওদিন নড়ে বসবে কিনা বলা কঠিন, এমনই হতভাগ্য নিম্ন আসামের এই বিস্তীর্ণ এলাকা, প্রতিবেশী হিসেবে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন পূর্ব ডুয়ার্সের মানুষও। কিন্তু কলকাতার নিউজ চ্যানেলগুলিরই বা দায় কোথায়?

শৈবাল দত্ত

বন্ধ হওয়ার মুখে শিলিগুড়ির স্পোর্টস লাইব্রেরি

মাত্র সাত বছরেই নাভিশ্বাস উঠেছে শিলিগুড়ি স্পোর্টস লাইব্রেরি তথা মিউজিয়ামটির। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ‘শূন্য’তে এসে ঠেকেছে। দেয়াল থেকে খসে পড়ছে প্লাস্টার, ফার্নিচারের অবস্থাও তথৈবচ। ক্রীড়ামোদীদের শহর শিলিগুড়িতে এ নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। ২000 সালের ১০ অগাস্ট সৌরভ গাঙ্গুলি, রাহুল দ্রাবিড়, ইরফান পাঠানদের উপস্থিতিতে সূচনা হয়েছিল ‘ক্রীড়াদীপ্তি’র। বিখ্যাত খেলোয়াড়দের ব্যবহৃত জার্সি, বল, ব্যাট, জুতো, জামা, স্ট্যাম্প ইত্যাদিতে সাজানো হল, যা সহজেই ক্রীড়ামোদীদের আকৃষ্ট করতে শুরু করল। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে খেলতে এসেছেন অথচ এই মিউজিয়ামে আসেননি এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যাও কম। অথচ সেই ‘ক্রীড়াদীপ্তি’ স্পোর্টস লাইব্রেরি মিউজিয়ামটির আজ এই দুর্দশা কেন সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। শিলিগুড়ির সীমানা-ব্যস্ততা— জনসংখ্যা সবই বাড়ছে হু হু করে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জীবনের নানা জটিলতা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও খেলাধুলার কদর আগাগোড়াই ছিল এ শহরে। সেজন্যই বোধহয় ‘ক্রীড়াদীপ্তি’র বর্তমান হাল সত্যিই খানিকটা অবাক করে।

সোমনাথ রায়

প্রকাশিত চিঠিপত্রের দায় ‘এখন ডুয়ার্স’ সম্পাদকীয় বিভাগের নয়, নিছকই পাঠকের একান্ত ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

সোনালি চা-শ্রমিক সমবায়ের সাফল্যে ভীত কায়েমি শক্তি জোটবদ্ধ হয়েছিল

কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী ব্যাঙ্কের বোর্ড মিটিং-এর পর ঘোষণা করেছিলেন চা-বাগান বন্ধ করে মালিক যদি চলে যায় তবে শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে বাগানটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাঙ্ক তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। আজকের এই প্রতিবেদনে সেদিনের সোনালি চা-বাগানের সমবায় গঠন ও পরিচালনা নিয়ে আলোচনার আগে এই প্রজন্মের নেতা সৌরভ চক্রবর্তীর এই ঘোষণার কথা উল্লেখ করাটা প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ার কারণ হল, চা বাগিচার এই ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যা নিরসনে যে সোনালি চা-শ্রমিকদের সেই উদ্যোগ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ তা আজকের প্রজন্মের তরুণরাও অস্বীকার করতে পারছে না।

সোনালি শ্রমিক সমবায়ের যাত্রা

শাঁওগা (সোনালি) শ্রমিক সমবায়ের রেজিস্ট্রি হয়েছিল ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৭৮ সালের ১০ জুলাই আদালতের এক আদেশে তাদের বাগান পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরে আসতে হয়েছিল। অর্থাৎ তারা সেই হিসাবে তিন বছর দশ মাস মাত্র বাগানটিকে পরিচালনা করতে পেরেছিল। তবে সাফল্য তথা কৃতিত্বের বিচার সব সময় সময়ের দৈর্ঘের বিচারে মাপা যায় না। শের শাহ এদেশে রাজত্ব করেছিলেন মাত্র পাঁচ বছর। অথচ তিনিই ভারতের মুসলিম তথা সুলতান রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুশাসক বলে চিহ্নিত হন (বাদশা আকবরের রাজত্বকাল অবশ্য অন্য দিক থেকে বিবেচনা করা হয়)।

সোনালি শ্রমিক সমবায় আন্দোলন তাদের এই তিন বছর দশ মাস সময়ের মধ্যেই বাগান পরিচালনার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। মালিকের পরিত্যক্ত ও আকণ্ঠ ঋণে জর্জরিত সোনালি চা বাগানের সব কিছু নতুনভাবে শুরু হয়েছিল। কিছু শ্রমিক, বিশেষ করে 'বাবু' কর্মচারীদের মনে একটা সংশয় প্রথম থেকে ছিল। কোম্পানি ম্যানেজার ব্যাঙ্কের টাকা ছাড়া কোনও বাগান চলতে পারে এমন উদাহরণ আগে কোথাও যে চা শ্রমিক-কর্মচারীরা দেখেনি। তাই এই সংশয়ের জন্য তাদের দায়ী করা মোটেই ঠিক নয়। এছাড়াও সমবায়ের সংগঠকের মধ্যে একটা উদার ভাবনা ছিল— যারা সমালোচক বা সংশয়বাদী তারাই সমবায় বিরোধী, এমন ধারণা তারা পোষণ করতেন না। তাই যাদের মনে সংশয় ছিল তাদের সঙ্গে নানা আলোচনার মাধ্যমে সেই সংশয় দূর করার চেষ্টা করেছেন।

চা-বাগানের প্রশাসনিক কাঠামোকে তুলনা করা যায় পিরামিডের সঙ্গে। সবার উপরে বড় সাহেব। তার নিচে থাকে দু'জন ছোট সাহেব। একজনের দায়িত্বে বাগিচা অপরজনের দায়িত্বে থাকে ফ্যাক্টরি। এরপর ক্রমান্বয়ে বড়বাবু, ফ্যাক্টরিবাবু, বাগানবাবু, আপিসবাবু, রেশনবাবু, মালবাবু ছাড়াও কয়েকজন কেরানি ও পিওন। সবশেষে কুলি। বড় সাহেবের সঙ্গে সাধারণ কুলি তো দূরের কথা অধস্তন বাবুদের পর্যন্ত সরাসরি সাক্ষাৎ বা যোগাযোগের কোনও নিয়ম নেই। কিছু জানাতে হলে তা জানাতে হবে বড়বাবুর মারফৎ।

প্রাক স্বাধীনতা যুগের যে ছবিটা

কোম্পানি ম্যানেজার ব্যাঙ্কের টাকা ছাড়া কোনও বাগান চলতে পারে এমন উদাহরণ আগে কোথাও যে চা শ্রমিক-কর্মচারীরা দেখেনি। তাই এই সংশয়ের জন্য তাদের দায়ী করা মোটেই ঠিক নয়। এছাড়াও সমবায়ের সংগঠকের মধ্যে একটা উদার ভাবনা ছিল— যারা সমালোচক বা সংশয়বাদী তারাই সমবায় বিরোধী, এমন ধারণা তারা পোষণ করতেন না।

চা-বাগানের অতি পরিচিত দৃশ্য ছিল সেটা হল, সূর্য ওঠার আগেই ঘোড়ার পিঠে আরোহী শ্বেত চামড়ার বড় সাহেব অফিসের সামনে খোলা মাঠে হাজির। কুলিরা এর আগে এসে বাগানের কাজে যেতে সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাহেবের সেই আরবীয় ঘোড়াটি সাহেবীয় পদক্ষেপে বড় সাহেবকে পিঠে নিয়ে কুলির সারির সামনে দাঁড়ায়। কুলিরা কপালে

পাঁচ আঙুল ঠেকিয়ে 'সেলাম হুজুর' জানিয়ে একে একে বাগানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কুলিরা যাবার পর তার পেছনের মুনশি, চাপরাশি, বহিদার, দফাদারও একই কায়দায় সাহেবের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে কাজে যায়। বড় সাহেবের মুখে লেগে থাকে শাসকের অহংবোধের হাসি।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও এই পিরামিড আকৃতির প্রশাসনিক ছবিটা মোটামুটি একই রকম ছিল। সমবায়ের খোলা হাওয়ায় সেই ঘুণধরা পিরামিডের প্রশাসনিক কাঠামোটি ধ্বসে গেল। পিরামিডের আকৃতিটিই গেল উল্টে। সেদিনের কালা আদমি কুলি ছেলেমেয়েরাই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল সবার সামনে। অভ্যেসের বেড়িকে খুলে ফেলা খুব সহজ ছিল না। এতদিন যারা অফিসের হুকুম বহন করে সবচেয়ে নিচের লোকের উপর ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াত তারা তাদের ছড়ি ফেলে দিয়ে কী করবে তা বুঝতে অবশ্যই সময় লেগেছিল।

শ্রমিক সমবায়ের প্রধান হাতিয়ার প্ল্যান্টার্স ও প্ল্যাকার্স অর্থাৎ চায়ের ঝোপ ও পাতা তোলার মানুষ। এই দুটোকেই সযত্নে বাঁচাতে হবে এবং বাড়াতে হবে। শ্রমিকেরা যখন নিজের তাগিদে বাগানের কাজকে নিজের মনে করে কাজে নামে তখন তাদের উপর খবরদারি করার লোকের প্রয়োজন হয় না। বরং এদের পোষার অর্থ অনুৎপাদক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। প্রথম বছরটা ছিল সমবায়ের পক্ষে খুব কঠিন সময়। চারপাশে সবারই সতর্ক দৃষ্টি। গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে সমবায়ের ভুল পদক্ষেপের জন্য। সমবায় প্রথম বছরেই কয়েকটি বুনিয়াদি পরিবর্তন ঘটিয়ে সেই সমস্ত শকুনি চোখকে আরও ধারালো করে তুলেছিল। চা শিল্পের কোথাও তখন নারী-পুরুষের সমান মজুরি ছিল না। একজন নারী শ্রমিক পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় দৈনিক ১৭ পয়সা কম মজুরি পেত। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে সমকাজে নারী ও পুরুষের সম মজুরির বিলটি লোকসভায় পেশ হলেও তা আইনে পরিণত হতে সময় নিল আরও এক বছর। সোনালি চা শ্রমিকরা সমবায় গঠন করেই ১৯৭৪ সালের মে মাসে লোকসভায় এই বিল পেশ করার আগেই নারী ও পুরুষের সম মজুরির কথা ঘোষণা করে দেয়।

মেয়েরা যে পাতা তোলার কাজে পুরুষের তুলনায় বেশি নিপুন সে কথা চা-বাগানের মালিকেরা অস্বীকার করে না। চা-বাগানের সুনাম নির্ভর করে এই পাতা তোলার কাজের উপর। কারণ এর উপর চায়ের গুণমান অনেকটা নির্ভর করে। তবু চা মালিকেরা যে নারী শ্রমিকদের পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি দেয় তার যুক্তি হাজির করতে তারা জানাত একজন পুরুষ শ্রমিক নারী শ্রমিকের তুলনায় বেশি পরিশ্রমী। এই প্রসঙ্গে তারা দেখাত শীতকালীন চাষে পুরুষেরা কোদাল ও ছুরি চালানোর মতো কঠিন কাজ করে।

সমবায়ের পক্ষে জানানো হল, চা পাতা তোলা ছাড়াও নারী শ্রমিকেরা যে জল তোলা, কাঠ কাটা, রান্না করা, বাসন মাজা, সন্তান ধারণ করা ও তাদের প্রতিপালন করা সেটাও তো শিল্প সমাজের কাজ। নারীরা তাদের বাগানের কাজের পর এই সমস্ত কাজ করে বলেই পুরুষ শ্রমিকেরা বাইরে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের এই সম্মিলিত শ্রমদানের ফলেই উৎপন্ন হয় সামগ্রিক ভাবে সামাজিক উৎপাদন। তাই নারী ও পুরুষ শ্রমিকের এই মজুরি বৈষম্য থাকতে পারে না। সমবায়ের পক্ষ থেকে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সমহারে মজুরি প্রদানের কথা খোদ রাজধানী দিল্লিতেও চমক সৃষ্টি করেছিল। দিল্লির অল ইন্ডিয়া উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১০ হাজার মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

চা-বাগানে পাতা তোলার মরসুমে সারাদিনে নির্দিষ্ট ঠিকার উপর পাতা তুলতে পারলে কেজি প্রতি ৭ পয়সা হারে উৎসাহদায়ক বাড়তি পয়সা দেওয়া হত। অর্থাৎ একজন শ্রমিক যদি অতিরিক্ত ১০ কেজি চা উৎপাদন করতে পারত তবে তারা ৭০ পয়সা বাড়তি পেত। চা-বাগানের মালিকেরা বাগানের চা পাতা তোলার ঠিকার নির্দিষ্ট পরিমাণ এত উঁচুতে বেঁধে দিত যে অতি দক্ষ শ্রমিকরাও পাতার মরসুমে সামান্য কিছু অতিরিক্ত আয় করত। তাও এমন দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা ১০-১৫ শতাংশের বেশি ছিল না।

সোনালি সমবায় সিদ্ধান্ত নিল তারা ঠিকার এই নির্দিষ্ট পরিমাণের সীমা কমিয়ে দেবে আর উৎসাহদায়ক (ইনসেনটিভ) ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। তারা প্রথমে ৭ পয়সার পরিবর্তে ১০ পয়সা নির্দিষ্ট করল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সব শ্রমিকেরই ন্যূনতম রোজগার বৃদ্ধি এবং দক্ষ শ্রমিকের আরও বেশি রোজগার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সে সময়ে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সরকার নির্ধারিত দৈনিক মজুরি ছিল তিন টাকা।

বাগিচা আইন অনুসারে শ্রমিকেরা দু'বছর অন্তর ছাতা, অ্যাপ্রন, সোয়েটার অথবা কম্বল পাওয়ার অধিকারী। এর সঙ্গে বছরে দু'বার দেওয়ার কথা পাতা তোলার রুমাল। এখানে চলে বাগানের ম্যানেজার ও পারচেজ অফিসারদের কাট মানির খেলা। নিম্নমানের জিনিস দিয়ে বাকি টাকা পকেটে ঢোকানো এখানে নিয়ম বলেই মনে করা হয়। শ্রমিকদের যা দেওয়া হয় তাই তাদের নিতে হয়।

সোনালি চা-বাগানের মালিক তো এখন শ্রমিকেরা। তাদের হয়ে প্রতিনিধি রূপে শ্রমিকেরাই গেল বাসে চেপে শিলিগুড়িতে তাদের জিনিস তারাই পছন্দ করে কিনে আনতে। হিলকার্ট রোডের নামি ছাতার দোকান সেন ব্রাদার্স। নকশা করা বাঁশের বাট সহ ছাতা কেনা হল। দাম পড়ল ছাতা প্রতি ১২ টাকা। ছাড় দেওয়া হল ৮ আনা করে। এরা সমবায় করেছেন জেনে মালিকের পক্ষ থেকে ঠান্ডা পানীয় ও মিঠা পান দিয়ে এদের উৎসাহ দেওয়া হল। শ্রমিকেরা বেছে নিল সেঞ্চুরি মিলের ভাল কাপড়। কেনা হল ভাল ত্রিপল শিট ও হেশিয়ান ক্লথ।

মনে হতে পারে সমবায় পরিচালকেরা খরচের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা তা নয়। এতদিন শ্রমিকদের হাতে নিম্ন মানের জিনিস ধরিয়ে দিয়ে বাগানের খাতায় উঁচু মানের দাম দেখানো হত। এছাড়া সমবায় পরিচালকেরা জানিয়েছিল ভাল জিনিস বেশি দিন টিকবে বলে এর গড়পরতা খরচ কম। অন্যদিকে এর ফলে শ্রমিকদের মনে সমবায় সম্পর্কে একদিকে যেমন একটা গর্ব হবে অপরদিকে অন্য বাগানের শ্রমিকেরা জানতে পারবে তারা কি মানের জিনিস পাওয়ার অধিকারী।

শ্রমিক সমবায়ের খবর সেদিন ডুয়ার্সের অন্য চা বাগানগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় প্রতিদিনই অন্য বাগান থেকে শুধু যে শ্রমিকরা আসত তা নয় ম্যানেজমেন্টের লোকেরাও কৌতূহল নিয়ে সেখানে আসত। এমনকি ডুয়ার্স ব্র্যাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান তথা ডানকান অ্যাগ্রোর বড় সাহেব মিস্টার জন গ্রিমার নিজেই ভোরবেলায় হাজির হয়েছিলেন সমবায়ের কাজ দেখতে। গাছের যত্ন, চেহারা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে পরিদর্শকের খাতায় ভূয়সী প্রশংসা করে তার মন্তব্য লেখেন। সমবায় গঠিত হওয়ার পর এখানে কোনও চার্জশিটের ঘটনা নেই, অনুপস্থিতি বা দেরীতে কাজে আসা যা চা-বাগান পরিচালন ক্ষেত্রে ক্রণিক রোগের মতো সমস্যা তার কোনওটাই এ বাগানে নেই। এই সব ব্যাপার জেনে জন গ্রিমার এখানকার শ্রমিক প্রতিনিধিদের তার বাগানের শ্রমিকদের কাছে এই প্রসঙ্গে বলার অনুরোধ জানিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। শ্রমিকের আমব্রেলা অ্যাপ্রন দেখে মন্তব্য করেছিলেন এসব অন্য বাগানের শ্রমিকেরা দেখতে পেলে সেখানে বাগান চালানোই কষ্টকর হয়ে উঠতে পারে। গ্রিমার সাহেবের এমন ভাবে হঠাৎ বাগানে আসার পিছনে কী অভিসন্ধি ছিল সেই প্রসঙ্গে আলোচনার আগে বলে নিতে হবে, ডুয়ার্সের চা বাগিচা মালিকের সংগঠনের প্রধান হিসাবে তিনি সোনালি চা বাগানের চা-শ্রমিকদের রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সমস্ত বাগানের শ্রমিকদের রেশন দিতে চাল গম সরবরাহ করা হত মালিক সংগঠনের তত্ত্বাবধানে।

মালিকানার আমলে এই বাগানে বেতন ও রেশন দেবার কোনও নির্দিষ্ট তারিখ ছিল না।

এই সমবায় গঠনের পেছনে কোনও প্রচলিত রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা নেই, এটা ছিল এদের আর একটি অপরাধ। বাগান চলছে কোনও দলীয় ঝান্ডার অভিভাবকত্ব ছাড়াই। এটা যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই মন্দিরের দেব আরাধনার কালোপাহাড়ি কাণ্ড। তাই তাকে বিনষ্ট করতে ক্ষমতার পুরোহিতরা যে একজোট হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তাই মাস শেষ হলেও শ্রমিকেরা তাদের বেতন, রেশন পাবে কিনা তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় ভুগত। সমবায়ের পক্ষ থেকে বেতন, রেশনের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হল। প্রতিমাসের তিন ও চার তারিখ নির্দিষ্ট হল বেতনের জন্য। প্রতি সপ্তাহে বুধবার অ্যাডভান্স পেমেন্ট এবং বৃহস্পতিবার রেশন। প্রতি পনেরো দিন পর বাড়তি পয়সা। মালিকের আমলে শ্রমিকের বেতন, রেশন নানা অজুহাতে বাকি রাখলেও সমবায়ের চার বছর সাত মাস পরিচালনাধীন অবস্থায় এই পদ্ধতির একদিনও নড়চড় হয়নি।

সোনালি সমবায়ের সাফল্য ভীতির কম্পনও সৃষ্টি করেছিল

ফ্যাক্টরি নেই। মালিক পলাতক। মৃতপ্রায় একটি ছোট্ট চা-বাগানের মৃতপ্রায় শ্রমিকেরা বাগানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে নিজেদেরও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মতো এমন অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলায় অন্যসব বাগানের মালিক ব্যবসায়ী মহল তো বটেই তাদের সঙ্গে প্রথাগত তথাকথিত শ্রমিকনেতা ও রাজনীতির কারবারিরা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। দৈব্যবাণীর ভয়ে কংসের রাজত্বে সমস্ত সদ্যজাত শিশুদের হত্যা করার মতো চা সাম্রাজ্যের ওই সব কংসরাও প্রভূত সম্ভাবনাময় শিশু সমবায়টিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে সরকারি ও বেসরকারি শক্তি ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। সমবায়ের সাফল্য চা বাগিচা মালিকের লুঠের গোপন রাস্তাগুলিকে একেবারে প্রকাশ্যে হাজির করে দিল। মালিকের মালিকানায় যে বাগানের ব্যালান্স শিটে প্রতিবছরই লোকসানের হিসেব থাকে। বাগানকে মৃত ঘোষণা করে লুঠের মালকে সিন্দুক বোঝাই করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়ে সমস্ত ঋণের বোঝা শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেয়। সেই বাগান কোন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যের স্পর্শে এভাবে শুধু জেগে ওঠাই নয় বাগানকে লাভের মুখ দেখাতে পারে তা যে মালিকদের এতদিনের সব সাজানো যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়। একে তো তাই ভাঙতেই হবে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে, কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রীদের কাছ থেকে প্রচলিত ভাবনায় এই সমবায় সংস্থার বিরোধিতা করার কথা থাকলেও তারা কিন্তু এর জন্য সক্রিয় ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলেও এর বিরোধিতা করেননি, বরং পরোক্ষ ভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে এই সমবায় আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয়ভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত হবে এই বিশ্বাস থাকার কথা হলেও তাদের কাছেই শ্রমিকের এই অধিকার প্রতিষ্ঠাকে শ্রমিকের ধৃষ্টতা বলে চিহ্নিত হয়েছিল।

এই সমবায় গঠনের পেছনে কোনও প্রচলিত রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা নেই, এটা ছিল এদের আর একটি অপরাধ। বাগান চলছে কোনও দলীয় ঝান্ডার অভিভাবকত্ব ছাড়াই। এটা যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই মন্দিরের দেব আরাধনার কালোপাহাড়ি কাণ্ড। তাই তাকে বিনষ্ট করতে ক্ষমতার পুরোহিতরা যে একজোট হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তা নাহলে বাগানে মালিকের চুরি ধরা পড়বে। শ্রমিকেরা কাজ পেলেও সাম্রাজ্য হারাবে ট্রেড ইউনিয়ান তথা ট্রেড ইউনিয়ানের বাবু নেতারা। বাগানের চুরি বন্ধ হলে ভাগের মাসোহারা হারাবে আমলা থেকে শুরু করে বাবু নেতারা। কাট মানি দিয়ে ব্যবসায়ীরা যে মুনাফার পাহাড় গড়ে সেখানে নামবে একের পর এক ধ্বস।

দেখতে হবে সমবায়ের এই সাফল্যের গোড়াপত্তন থেকে। পলাতক সেই মালিক বাগানে কোনও অস্থাবর সম্পদ রেখে যায়নি যা বিক্রি করে পুঁজি জোগাড় হবে। পুঁজি ছাড়া কোনও প্রতিষ্ঠানই চলতে পারে না। কিন্তু পুঁজির জন্য অর্থ জোগানদার তো ছিল না। ব্যাঙ্ক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা কিংবা কোনও শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী এই রুগ্ন বাগানটিতে যে অর্থ লগ্নি করতে এগিয়ে আসবে না সেটাই স্বাভাবিক। কোম্পানি তো বেপাত্তা। কাকে টাকা দেবে? কোন সম্পত্তি দেখে টাকা দেবে? তাই বাইরে থেকে পুঁজির অর্থ সংগ্রহ করার কোনও উপায় ছিল না শ্রমিকদের। কিন্তু তারা জেনেছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পুঁজি মানুষের শ্রম। তাই তো সরকারিভাবে এই দপ্তরের নামকরণ হয়েছে মানব সম্পদ মন্ত্রক।

আগেই বলা হয়েছে কাজের শুরুতে শ্রমিকদের হাতে যৎসামান্য এক বা দেড় টাকা হাজিরা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাগানের কিছু শুকনো গাছ ও খড় বিক্রি করে। শ্রমিকেরা কিন্তু চা-বাগানের (ছায়া) গাছগুলিকে খিদের তীব্র জ্বালা থাকা সত্ত্বেও বিক্রি করেনি। তারা যে জানত চা গাছকে বাঁচাতে পারলে তারাও বাঁচার কথা ভাবতে পারবে। ওই শুকনো গাছ ও খড় বিক্রির টাকাই (তিন-চার হাজার টাকা) ছিল তাদের প্রথম পুঁজি, প্রকৃতির দান। সমবায়ের বিরোধিতা পুঁজিকে নিয়ে নয়, বিরোধিতা পুঁজিপতির শোষণের বিরুদ্ধে। সোনালি সমবায়ের শ্রমিকেরা প্রমাণ করলেন পুঁজি কোনও ব্যক্তির কুক্ষিগত নয়, এটি সামাজিক শক্তির হাতিয়ার।

যে চা-বাগানের মালিকেরা বাগানের লোকসানের বোঝা বইতে না পারার জন্য মৃত বাগান ঘোষণা করে চলে গিয়েছিল সেই বাগানের শ্রমিকেরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া টাকা দিয়ে এক বছরের মধ্যেই ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা মূলধন গড়ে তুলল। এর পরের বছরেই শ্রমিকদের এই টাকা সমবায় থেকে ফিরিয়ে দিতে পারল। ৪০ পয়সা কিলো দরে শ্রমিকদের চাল-গম দেওয়া হল। এরা প্রমাণ করল, মূলধনকে যদি সৎ ও সঠিক ভাবে ব্যবহার করা যায় তবে মূলধন এনে দেয় আরও মূলধন।

চা-বাগানে অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদন কম করে দেখানো হয়

চা-বাগানের উৎপাদনের পরিমাণ ঘোষনায় থাকে নানা কারচুপি। উৎপাদন কম দেখাতে পারলে সরকারি শুল্ক যেমন ফাঁকি দেওয়া যায় তেমনই বাগানকে লোকসানের খাতায় তুলে রাতের অন্ধকারে বন্দোবস্তের মাধ্যমে সেই চা পাচার করে যার যা প্রণামী মিটিয়েও পাওয়া যায় মোটা টাকা। সোনালি চা-বাগানের শ্রমিকেরা মালিকদের সেই পুকুর চুরির মতো চা চুরির গোপন কক্ষের দরজাটাকে হা করে খুলে ছিল।

সোনালি চা-বাগানে চা আবাদের পরিমাণ খাতায় কলমে ৪৫৮ একর দেখালেও প্রকৃত পক্ষে চা আবাদের জমির পরিমাণ ছিল তার থেকে অনেক কম। বহুদিনের অযত্ন ও পরিচর্যার অভাবে ২০ থেকে ২৫ ভাগ চা এর আগেই মরে গিয়েছিল। চা-বাগিচার ভাষায় একে বলা হয় 'বুশ ভ্যাকেন্সি'। 'রি-প্ল্যানটেশন স্কীম' অর্থাৎ নার্সারি তৈরি করে প্রতি বছর মরা বা অতিবৃদ্ধ চা গাছের পরিবর্তে নতুন চা চারা গাছ বপনের কথা থাকলেও আগের দুই মালিকের কেউ তা করেনি।

কোম্পানির যখন রমরমা অবস্থা ছিল

যারা প্রথমে ভেবেছিল বাগানটি একটি ডুবো জাহাজ তাদের অনেকেই গুটি গুটি পায়ে বাগানে এলো যারা দুর্দিনে ছিল না। কিন্তু তাদের তাড়িয়ে না দিয়ে সাদরে বরণ করে নেওয়া হল। এক শ্রমিক আর এক শ্রমিককে শ্রেণিশত্রু ভাবে না সেই বিশ্বাসটা যে তাদের ছিল।

সেদিন এই বাগানের বাৎসরিক কাঁচা চা পাতার পরিমাণ কখনও আট লাখ কেজির বেশি হয়নি। সমবায়ের ঘোষণা হল, 'চায়ের ঝোপ' আর 'পাতা তোলার মানুষ'— এরাই চা-বাগানের দেবতা। তাই যত কম সময়ে সম্ভব এই দুই 'দেবতাকে' সতেজ করতে হবে। যত উৎপাদন ততই শ্রমিকের উপার্জন।

সমবায়ের কাছে উৎপাদন বৃদ্ধি এত সহজ ছিল না। পদে পদে নানা প্রতিবন্ধকতা। সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ছিল কিছু শ্রমিকের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাসের অভাব সৃষ্টি করা হয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনা। প্রথম বছর উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে এক লক্ষ কেজি চা পাতা কম উৎপাদন হল। বসল সভা। কাল্টিভেশন ওয়ার্কসহ পরিচর্যার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হল। চা-শ্রমিকের সমবায়কে ভাঙার জন্য বাম-ডান মালিক-আমলারা যেমন জোটবদ্ধ হয়েছিল, চা বাগিচায় সমবায়ের প্রতি সমর্থন জানাতে প্রকাশ্যে না হলেও সমর্থন ও সাহায্যের মানুষও ছিল। বেশ কয়েকটি বাগান থেকে সিনিয়ার ম্যানেজারেরা নিজে থেকেই বাগানে এসে সমবায়কে বাগানের চাষ ও পরিচালনার পরামর্শ দিতেন। তারাই জানালেন আগের মালিকেরা মাটি থেকে তার শক্তি শুধু ব্যবহার করেছে কিন্তু মাটিকেও যে তার সেই শক্তি পুনরুদ্ধার করতে খাদ্য দেওয়া দরকার তার কথা একবারের জন্যও ভাবা হয়নি। অর্থাৎ চায়ের পাতার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে বাগানে প্রয়োজন নাইট্রোজেন সার।

এতদিন সার সরবরাহের জন্য মালিকই বেনামীতে সরবরাহ সংস্থা খুলত। ভর্তুকিতে সার এনে সেই সার চা বাগানের জমিতে ব্যবহার না করে সেই সার খোলা বাজারে বিক্রি করা তো জানা ব্যাপার। লুঠের উপরে ছিল লুঠ। সমবায় সমিতি স্থানীয় বেকার যুবকদের নিয়ে গঠন করল সার সরবরাহের সমবায় সমিতি। এদের মারফৎ ১৯৭৫ সালে ৭০ হাজার টাকায় কেনা হল ত্রিশ মেট্রিক টন সার। পরের বছরেও কেনা হল একই পরিমাণ সার। তখন কংগ্রেসি রাজত্ব। অথচ সমবায় পরিচালিত সোনালি চা-বাগান যাতে শিলিগুড়ির সরকারি স্টক থেকে সার পেতে কোনও অসুবিধার মধ্যে না পড়ে তার নির্দেশ পাঠিয়েছিল। দ্বিতীয় বছরেও উৎপাদন কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেল না। এতদিনের অভুক্ত মাটি সবল হতে সময় লাগে। সে বছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল অসম। এছাড়া এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে মাটি-মানুষ-গাছের একটা টিউন যাকে বলা হয় পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে একটা সমন্বয় আনার জন্য প্রয়োজন ছিল কিছুটা সময়। তৃতীয় বছরে কিন্তু তারা ফল পেল। এই বাগানের ইতিহাসে কাঁচা পাতা উৎপাদনের সর্বকালের রেকর্ড করে তারা উৎপাদন করল ১০ লাখ ৪০ হাজার কেজি চা।

কাঁচাপাতা বিক্রির দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চা-শ্রমিকদের মজুরিও বাড়ানো হতে থাকল। পাতা বিক্রির শুরুতে দাম ছিল প্রতি কেজি ৬৫ পয়সা। শ্রমিকদের তখন দিতে পারা গিয়েছিল দৈনিক ১২ আনা মজুরি। দ্বিতীয় বছরে কাঁচাপাতার বিক্রির দাম বৃদ্ধি পেয়ে হল দিন প্রতি তিন টাকা করে। পুরো মজুরি দেওয়ার তারিখটা আজও সেই সমবায় চা-শ্রমিকেরা বয়স বৃদ্ধির ভারে মন থেকে মুছে ফেলেনি। সেদিনটা ছিল ১৯৭৫ সালের ৭ জুন। যারা প্রথমে ভেবেছিল বাগানটি একটি ডুবো জাহাজ এখানে থাকার অর্থ সলিল সমাধিতে যাওয়া তাদের অনেকেই গুটি গুটি পায়ে বাগানে এলো যারা দুর্দিনে ছিল না। কিন্তু তাদের তাড়িয়ে না দিয়ে সাদরে বরণ করে নেওয়া হল। এক শ্রমিক আর এক শ্রমিককে শ্রেণিশত্রু ভাবে না সেই বিশ্বাসটা যে তাদের ছিল।

বাগানে ছিল একটি ডিসপেনসারি। সেখানকার ডাক্তারবাবু বাগান বন্ধ হওয়ার পর বাগানের কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি দুঃসময়ে বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য লিখিত ভাবে ক্ষমা চেয়ে আবার নতুন করে গড়ে তোলা বাগানের ডিসপেনসারির দায়িত্ব নিতে আবেদন জানালে সমবায় সমিতি তাকে আবার কাজে ফিরিয়ে নিল। তবে আগের বেতন থেকে এক ধাপ বেতন কমিয়ে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য দুর্দিনে যারা মাটি আঁকড়ে বাগানটিকে বাঁচাতে লড়াই করেছিল তাদের সম্মান জানানো।

কোম্পানির আমলে বাগানে ছিল একটা পুরনো জিপ গাড়ি, একখানা জীর্ণ বেডফোর্ড ট্রাক, আর টি বোর্ড থেকে ঋণ করা টাকায় একটি রাশিয়ান ট্রাক্টর। খেমকারা বাগান ছেড়ে যাওয়ার সময় সেগুলো সব হাতিয়ে নিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে সমবায়ের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৫৬ হাজার টাকায় কেনা হল মহিন্দ্রা কোম্পানির নতুন ডিজেল জিপ। পরের বছর সম্পূর্ণ নিজের টাকায় কেনা হল ফোর্ড কোম্পানির নতুন ট্র্যাক্টর। দাম পড়ল ৬৮ হাজার টাকা। দু'বছরের আগেই জিপ গাড়ির ঋণের টাকা শোধ করে দেওয়া হল। এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ট্র্যাক্টরের সঙ্গে একটি ওয়াটার ট্যাঙ্কার এবং একটি ট্রেইলার তৈরি করে নেওয়া হল।

বাগানের যাবতীয় কাঁচা রাস্তা মেরামত করা হল। বাগানে ঢোকার সীমানায় পাকা রাস্তা থেকে অফিসে ঢোকার ২ কিমি রাস্তা গাড়ি চলার উপযোগী করতে বালি ও পাথর দিয়ে আমূল সংস্কার করা হল। বাগানে যে সরকারি প্রাথমিক স্কুলটি ছিল সেখানে ছিল না কোনও ছাত্রদের বসার ব্যবস্থা। একটি মাত্র চেয়ার ও একটি টেবিল শিক্ষকের বসার জন্য। ছাত্ররা সব বাগানের শ্রমিকের সন্তান। সমবায়ের ভাবনায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হল। ডাকা হল শ্রমিকদের। সমস্ত শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সরকারের অনুদানের জন্য অপেক্ষা না করে সমবায় থেকে তৈরি করা হল বেঞ্চ। শিশুদের জন্য কেনা হল স্লেট, পেনসিল, বই এমনকি খাবারের ব্যবস্থা। খোলা হল বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। প্রথম প্রথম একটা কিন্তু কিন্তু ভাব থাকলেও ৬২ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হল বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। গুরুদক্ষিণা ঠিক হল দু'টাকা। এতে শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে উঠল একটা দায়িত্ববোধ। বাগানে আয়োজন হল দশেরা মেলা। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হল আদিবাসী লোক সংস্কৃতির প্রতিযোগিতা। শুরু হল ফুটবল প্রতিযোগিতা। যোগ দিল অন্য বাগানের প্রতিযোগিরা। কিছু চাঁদা তোলা হল, বাকিটা দিল সমবায়।

এই সব কিছু কিন্তু করা হল সমবায়ের এই তিন বছর সাত মাসের মধ্যে। এসব কিছু করেও সোনালি চা-শ্রমিক সমবায় তাদের উদ্বৃত্ত আয় স্টেট ব্যাঙ্ক জলপাইগুড়ি শাখায় (অ্যাকাউন্ট নম্বর ১৬২৩) এবং জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে কয়েক লক্ষ টাকা জমা করে ফেলল। ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন জানালো তারা ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করে দেবে। ঘটনাগুলি যেন একের পর এক বোমা, মালিক ও চা বাগানকে ঘিরে যে কায়েমী স্বার্থ তার সদর দপ্তরে আঘাত করল। মালিক-আমলা-ট্রেড ইউনিয়ান নেতা, এমনকি ব্যাঙ্ক সবাই জোট বাধল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু বধের মতো সোনালি শ্রমিক সমবায়ের বিরুদ্ধে চক্রব্যুহ রচনা করে তাকে হত্যা করতে।

সৌমেন নাগ

রাজবংশী খানায় থাকে ওষুধের গুণ

আমগুড়ি গ্রামে যেসব রাজবংশী খাদ্য আমরা খেয়েছিলাম, তার একটার কথা আগের সংখ্যাতেই বলেছি। আপনারাও নিশ্চয়ই চেখে দেখেছেন শুঁটকি মাছের স্বর্গীয় রেসিপি 'সিদল'। এবার যেটার কথা বলছি, তার নাম 'মাগুর শুষনি'। সাধারণভাবে এটা মাগুর মাছের ঝাল নামেই পরিচিত। রাজবংশীদের অন্যতম প্রিয় শাক হল শুষনি। রাজবংশীরা খাদ্যবস্তুকে নিছক খাবার হিসেবে খায় না। তাঁদের বিশ্বাস যে তাঁদের প্রতিটি খাদ্যই পেট ভরাবার পাশাপাশি কোনও কোনও দিক থেকে ওষুধেরও কাজ করে। শুষনি শাকের ওষুধিগুণ তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আর মাগুর মাছের সঙ্গে সে শাক মিললে জিভে জল আসতে বাধ্য। এই রান্না যখন শুরু হবে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি চলছে। নৃপেন রায়ের বাড়ির উঠোন দিয়ে জল ছুটছে রান্না ঘরের পেছনে চা-বাগানের দিকে। এই অবস্থায় মাগুর মাছেরা আচমকা ঝুড়ি থেকে লাফিয়ে জলে ভেসে কেটে পড়ার তাল করলেও শেষ অবধি গ্রেপ্তার করে ওদের কেটে ফেলা হয়েছিল ঝটপট।

মাগুর শুষনি (মাগুর মাছের ঝাল)

এটা বানাতে আপনার লাগবে শুষনি শাক, মাগুর মাছ, রসুন, আদা, গোলমরিচ, লঙ্কা, কালোজিরে, সরষের তেল, হলুদ, লবণ। আদা-রসুন-গোলমরিচ বেটে নিতে হবে।

মাগুর মাছ মাঝারি টুকরো করে কেটে লবণ-হলুদ মাখিয়ে নেবেন। দেশি মাগুর হলে স্বাদ বেশি। শাক ধুয়ে (রাজবংশীদের মূল প্রথা হল, শাক সবজি মুছে নেওয়া। তাঁরা প্রকৃতিদত্ত ফল-সবজি ধুয়ে নেওয়ায় বিশ্বাসী নয়। ইদানীং প্রথা বদলেছে।) কুচো কুচো করে কেটে নিন। আগে মাছের টুকরোগুলি ভেজে রেখে দিন। তারপর সরষের তেলে কাঁচালঙ্কা আর কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে শুষনি শাক ভাজা শুরু করুন। ভাজতে ভাজতে মেশাতে থাকুন আদা বাটা আর রসুন বাটা। শেষে গোলমরিচ বাটা। ব্যাপারটা মাখো মাখো হয়ে এলে একটু জল ঢেলে দিন। মাছের ভাজা টুকরোগুলি ছেড়ে দিন তার মধ্যে। এবার হালকা আঁচে রেখে দিন কিছুক্ষণ। তারপর নামিয়ে ফেলুন। স্থানীয় মোটা চালের ভাতের সঙ্গে খেতে খেতে মনে হচ্ছিল 'ইল্লুস!' আপনি ঢেঁকি ছাটা চালের ভাত দিয়ে খেলে আনন্দে সিলিং ফ্যানের উপরে উঠে নাচবেন। ঝোল বানাতে চাইলে জল বেশি দিতে হবে। তবে এই ঝাল মাখা-মাখাই খেতে পছন্দ করেন রাজবংশীরা।

এখানে মনে রাখতে হবে যে মাগুর শুষনি ওরফে মাগুর মাছের ঝালের স্বাদটা আনা হয় গোলমরিচ ব্যবহার করে। তাই কাচালঙ্কা এক কাপ শাকের কুচি হলে দু'টোর বেশি দেওয়া হয় না। পেট শক্তিশালী হলে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেবেন। ভুলেও পেঁয়াজ দেবেন না। শাক আর মাছের নির্দিষ্ট অনুপাত নেই। আমাদের রান্নায় চারটে মাঝারি সাইজের মাগুরের জন্য তিন কাপ শাকের কুচি ব্যবহার করা হয়েছিল। রসুন ছিল দু'টো। তাহলে এবার বানিয়ে ফেলুন রাজবংশী স্টাইলে মাগুর মাছের ঝাল।

কানন রায়

ভজহরি মান্না®
স্বাদে গুণে ভরপুর আহার
Bengali Home Style Cuisine
Bhojohori Manna®
GOOD FOOD ! GREAT FUN !

SILIGURI
HOTEL GOLDEN MOMENTS
143 HILL CART ROAD SILIGURI 734001 © (0353) 2535826
FREE HOME DELIVERY 9434210011
KOLKATA | SILIGURI | PURI | BENGALURU | MUMBAI
www.bhojohorimann.com

ছিটমহলের ছেঁড়া কথা

চুক্তি-জনসমীক্ষা হয়ে গেলেও ছিটমহলের মাটি সাক্ষী রয়েছে ভূমিদস্যুদের অত্যাচার, খুন, অগ্নিসংযোগ, লুঠ এবং ছিটদখলের লড়াইয়ের। যা মানুষের জানা উচিত বিস্তারিত। আজ তৃতীয় পর্ব।

নাজিরগঞ্জ বা গরাতিশাল— ছিটদখলের ইতিহাসের একই ধারা, একই ধারাবাহিকতা। হয়তো কোনওটা আগে, কোনওটা পরে। পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের চোখে সব সময়ই ঈর্শার বস্তু ছিটমহল। কোচবিহার রাজ্যের এই সকল এলাকা রাজতন্ত্র অবসানের পর প্রকৃত অর্থেই অভিভাবকহীন। গণতন্ত্রের পথ ধরে চলতে শুরু করা জেলা কোচবিহারের নতুন নতুন অভিভাবকরা তখন গণতন্ত্রের নিয়মকানুন রপ্ত করতেই ব্যস্ত। সকলেরই নজর কলকাতা কিংবা দিল্লির দিকে। সেখানকার প্রভুরা যে পথে চালাবেন এখানকার নতুন নতুন রাজনীতির কুশীলবরা সে পথেই চলবেন— এটাই দস্তুর। আগে রাজ্য কোচবিহারের অভিভাবক ছিলেন একজন— রাজসিংহাসনে আসীন মহারাজা ভূপবাহাদুর রাজতন্ত্র অবসানের পর 'আমরা সবাই রাজা আমাদের-ই রাজত্বে'। অবাধ স্বাধীনতা। বাধাহীন উচ্ছ্বাস, প্রশাসন পরিচালনার অভিজ্ঞতা— সব মিলিয়ে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরতা। সবকিছুর যোগফল ছিটমহল বিনিময়। ১৯৫৮ সালের নেহরু-নুন চুক্তি। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা ধরেই নিলেন ছিটমহল এখন আমাদের সম্পত্তি।

নজরে ৭৮ গরাতিশাল। ঘুরো মিঞা না ঘুরণ মিঞার ১২ শত বিঘা ও তাঁর ভাই খরগোস মিঞার ২ শত বিঘা জমি পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের টার্গেট হয়ে উঠল। তাদের মস্ত দোতলা বাড়ি, দিগন্ত বিস্তৃত কৃষিজমি, বাঁশবাগান, ফল বাগান, শালবাগান, পুকুর ইত্যাদির প্রতি প্রতিবেশী এলাকার মানুষের লোলুপ দৃষ্টি। একদিকে বেরুবাড়ি নিয়ে উত্তেজনা, অপরদিকে ছিটমহল দখলের ষড়যন্ত্র। ভারতীয় প্রশাসন ভেবেই নিয়েছে বিনিময় চুক্তি যখন হয়েই গিয়েছে তখন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই সকল ছিটমহল এলাকা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। এক অদ্ভুত প্রশাসনিক নীরবতা। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির বিস্ময়কর নিস্পৃহতা ছিটমহলবাসীদের ভবিষ্যৎকে ক্রমশ ধোয়াশাচ্ছন্ন করে তুলল। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলেন না কিংবা উপর থেকে করতে দেওয়া হল না ছিটমহল বিষয়টিকে। এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র-ই হল শেষ কথা।

এই সুযোগে ঘুরণ মিঞার সম্পত্তির দখল নিতে শুরু হল—ষড়যন্ত্র। ঘুরণ মিঞার নাতি ৫৫ বছর বয়স্ক ইসমাইল মিঞার কথায়, মাঠের মধ্যেই ডাকাতদের হারে রে রে চিৎকারে বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙে যেত। মাঝে মধ্যে ডাকাতির অছিলায় বাংলাদেশি ভূমি দস্যুদের হামলার কথা প্রশাসনকে জানালেও তারা উদাসীন। ছিটমহল বলে কথা, সহজে কি সেখানে পৌঁছানো যায়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার পর অকুস্থলে পৌঁছাতে বেশ কয়েকদিন। বড় হ্যাপা, তাই প্রশাসন উদাসীন, নির্বিকার। যা হচ্ছে হোক মার্কা একটা ব্যাপার। যাই হোক এরকম একটি ডামাডোল পরিস্থিতিতে জমি দখলের ষড়যন্ত্রের মধ্যেই ঘুরণ মিঞাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হল। পরবর্তী টার্গেট তাঁর পুত্র মকবুল মিঞা। জমি দখলকে কেন্দ্র করে ক্রমশ উত্তেজনা বাড়তে থাকল ৭৮ গরাতিশাল ছিটমহলে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে জমির দখলদাররা চাষের জমিতেই মকবুল মিঞাকে পিটিয়ে খুন করে। সার্বিকভাবে আতঙ্ক নেমে আসে ছিটমহলগুলিতে। তবে ষড়যন্ত্র এখানেই থেমে থাকে না। ভূমিদস্যুদের পরবর্তী লক্ষ্য হয়ে ওঠেন মকবুল মিঞার ভাই মনসুর মিঞা। দুই বছরের মাথায় ডাকাতির অছিলায় মনসুর মিঞাকে গুলি করে খুন করে ভূমিদস্যুরা। দুষ্কৃতীদের নিরবিচ্ছিন্ন তাণ্ডব ও হত্যালীলা চোখের সামনে দেখতে দেখতে মকবুল মিঞার স্ত্রী জমিলা খাতুন টের পেয়ে যান যে, এর পরবর্তী লক্ষ্য তাঁর পুত্র ইসমাইল মিঞা। আর অপেক্ষা নয়, পুত্রকে বাঁচাতে জমি-বাড়ির মায়া ছেড়ে জমিলা খাতুন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় তাঁর ৮/৯ বছরের পুত্র ইসমাইলকে কোলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পাড়ি জমান ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের উত্তর বড় হলদিবাড়িতে। তাদের সমস্ত জমি ক্রমশ দখল নিয়ে নেয় সেখানকার ভূমিদস্যুরা। দখলদার বাংলাদেশিরাই ছিটমহলবাসী হিসেবে পরবর্তীতে পরিচিতি লাভ করেন। আর যার দাদু ছিলেন ১৪ শত বিঘা জমির মালিক সেই ইসমাইল মিঞা এখন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতকুড়া এলাকার একজন দিনমজুর। একজন উদ্বাস্তু শিরোপায় ভূষিত সবহারানো ভারতীয় নাগরিক। ছিটমহলের জমির কাগজ হাতে নিয়ে ছিটমহল বিনিময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে ইসমাইল মিঞা স্বপ্ন দেখেন, যদি সরকার বাহাদুর একবার তাঁর কথা ভাবে। ছিটবাসী হিসেবে ক্ষতিপূরণ যদি কিছু তাঁর জন্য বরাদ্দ হয়। গত ৩ জুলাই ২০১৫ বিভিন্ন ভারতীয় ছিটমহল থেকে একইভাবে উৎখাত হওয়া কয়েক শত মানুষের সঙ্গে কোচবিহার শহরের সাগরদীঘির পাড়ে মিছিলে পা মেলান, জেলা শাসককে ডেপুটেশন দেন ইসমাইল মিঞা, শরৎ রায়, রফিকুল ইসলাম, বিশ্বেশ্বর বর্মণ, আনারুল হক, হৃদয়নাথ রায় প্রমুখদের সঙ্গে। ইসমাইল মিঞার পূর্বপুরুষের চোদ্দোশত বিঘা জমিসহ ৭৮ গরাতি ছিটমহলের মোট উনত্রিশ শত বিঘা জমিতে

যার দাদু ছিলেন ১৪ শত বিঘা জমির মালিক সেই ইসমাইল মিঞা এখন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতকুড়া এলাকার একজন দিনমজুর। একজন উদ্বাস্তু শিরোপায় ভূষিত সবহারানো ভারতীয় নাগরিক। ছিটমহলের জমির কাগজ হাতে নিয়ে ছিটমহল বিনিময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে ইসমাইল মিঞা স্বপ্ন দেখেন, যদি সরকার বাহাদুর একবার তাঁর কথা ভাবে। ছিটবাসী হিসেবে ক্ষতিপূরণ যদি কিছু তাঁর জন্য বরাদ্দ হয়।

প্রশ্ন হল কেন এই হামলা, খুন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট? পরিকল্পিত হামলাকে ডাকাতি বলে প্রচার করা হল কেন? নিহত রমজান আলির লাশ পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে কাফন ও গোছল ছাড়া মাটিতে পুঁতে দিয়ে কেনই বা তা প্রচার করে ছিটমহল ঘেঁষা তিনটি ইউনিয়নের লোকজনদের প্রচার করে উত্তেজিত করে তোলা হল?

বর্তমান সময়কালে প্রায় চারশত পরিবারের বাস। এদের অধিকাংশই ষাটের দশক থেকে শুরু করে কোনও না কোনও সময়কালে গরাতিশালে আস্তানা গেড়েছেন। ছিটবাসী হিসেবে পরিচয় নিয়ে বসবাস করছেন। ২০১১ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জনগণনায় নাম নথিভুক্ত করে প্রকৃত ছিটবাসীর তকমা পেয়েও গিয়েছেন। এদের বাইরেও কিছু মানুষ আছেন যাদের হয়ত বসবাস ছিটমহল সংলগ্ন হাড়িভাসা, অমরখানা ও হাফিজাবাদ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে, তারা ভারতীয় ছিটমহলে ছলে-বলে-কৌশলে জমির দখল নিয়ে দিব্যি চাষ-আবাদও করে চলেছেন। এই মানুষরাই ছিটমহলে নাগরিক কমিটি তৈরি করেন, ছিটমহলের চেয়ারম্যান মনোনীত হন, বাংলাদেশের রাজনীতির কর্মকাণ্ডে ছিটমহলগুলিকে যুক্ত করবার চেষ্টা করেন, ভোটব্যাঙ্ক তৈরির কাজে ছিটবাসীদের ব্যবহার করেন। আবার এরাই ছিটবাসীদের মুক্তির দাবিতে ছিটমহল বিনিময় আন্দোলন গড়ে তোলেন। নিজেদের ছিটবাসীদের ত্রাতা হিসেবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। সবই এক প্রকার ছলনা। তবে ছিটগুলিকে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ বাধলেই এদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এদের চরিত্রগুলি প্রকাশ্যে চলে আসে। ৭৮ গরাতিশাল ছিটমহলে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত খুন, অগ্নিসংযোগ, লুঠ ইত্যাদি নারকীয় ঘটনাবলী একথাই প্রমাণ করেছে।

কী ঘটেছিল ২০১০ সালের ১৪ ও ১৬ অক্টোবর যথাক্রমে বৃহস্পতি ও শনিবার? সংবাদে প্রকাশ ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ৭৮ গরাতি ছিটমহলের বাসিন্দা জনৈক জাবেদ আলি, মুক্তিযোদ্ধা আইয়ুর আলি সহ ৫ জনকে খুনের পরিকল্পনা করে রমজান আলি ও ইয়াসিন আলির নেতৃত্বাধীন ২৫-৩০ জনের একটি ভাড়াটে দুষ্কৃতী দলকে ছিটমহলে পাঠায় গরাতি ছিটমহল নাগরিক কমিটির সদস্য জনৈক শাহ আলম মিঞা। শাহ আলম মিঞা সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তা হল, গরাতি ছিটমহলের নাগরিক কমিটির চেয়ারম্যান মফিজার রহমানের ঘনিষ্ঠ এই ব্যক্তি ছিটমহল পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশি এলাকা পূর্ব টোকাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গরাতি ছিটমহলের নাগরিক কমিটি গঠন নিয়ে বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর একটিকে নেতৃত্ব দেন। যাই হোক রমজান ও ইয়াসিনের নেতৃত্বাধীন ভাড়াটে গুণ্ডারা ছিটমহলে হামলা ও খুন করতে পারে—এই সংবাদ আগাম ছিটমহলে পৌঁছে যাওয়ায় জাবেদ আলিও ছিটবাসীদের সঙ্গে নিয়ে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। রমজান-ইয়াসিনরা তাদের পরিকল্পনা মতো বৃহস্পতিবার রাতে জাবেদ আলিকে হত্যার উদ্দেশ্যে গরাতিশালে প্রবেশ করলে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। ছিটবাসীরা তাদের তাড়া করলে ভাড়াটে গুন্ডাদলের অন্যান্য

সদস্যরা পালাতে সক্ষম হলেও রমজান আলিকে ছিটবাসীরা ধরে ফেলে। ছিটবাসীদের গণপ্রহারে রমজান আলি (৫০) নিহত হন।

গরাতিশাল পার্শ্ববর্তী হাড়িভাসা এলাকার বাসিন্দা পেশায় সাইকেল মেকার রমজান আলির গণপ্রহারে মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সমগ্র এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ শুক্রবার দিনভর রমজানের লাশ ছিটমহলে পড়ে থাকলেও আইনি জটিলতার কারণে বাংলাদেশের পঞ্চগড় থানার পুলিশ সেখানে না যাওয়ার সুযোগে গরাতি ছিটমহলের নাগরিক কমিটির চেয়ারম্যান মফিজার রহমান, শাহ আলম মেম্বার ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা নিহত রমজানকে ডাকাত বলে সাব্যস্ত করে ছিটমহলের অভ্যন্তরে লাশ পুঁতে ফেলে। তারা ঘটনাটিকে ডাকাতি বলে প্রচার করতে শুরু করে।

পাশাপাশি শুক্রবার গরাতিশাল ছিটমহলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় মাইকিং করে পরদিন অর্থাৎ শনিবার সকালে ছিটমহলের আশপাশে জমায়েত হবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এমনিতেই হাড়িভাসা অঞ্চলের বাসিন্দা রমজানের মৃতদেহ না পাবার কারণে ক্ষোভ জমছিল, তার উপর মাইক প্রচারের ফলে পার্শ্ববর্তী অমরখানা ও হাফিজাবাদ ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ শনিবার সকালে ছিটমহলের পাশে জমায়েত হয়। এরপর কয়েক হাজার বাংলাদেশি দলবদ্ধভাবে গরাতিশাল ছিটমহলে প্রবেশ করে নির্বিচারে লুটপাট ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। ঘটনায় শতাধিক বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুরু হয় বিষয়টি নিয়ে চাপান-উতোর। আক্রমণকারীরা শুধুমাত্র ছিটমহলে অগ্নিসংযোগ করেই ক্ষান্ত হননি, তারা বাংলাদেশি ভূখণ্ডের দক্ষিণ টোকাপাড়া গ্রামের জনৈক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং জাবেদ আলির সহযোগী আইয়ুব আলির বাড়ি ঘরেও অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটায়। প্রশ্ন হল কেন এই হামলা, খুন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট? পরিকল্পিত হামলাকে ডাকাতি বলে প্রচার করা হল কেন? নিহত রমজান আলির লাশ পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে কাফন ও গোছল ছাড়া মাটিতে পুঁতে দিয়ে কেনই বা তা প্রচার করে ছিটমহল ঘেঁষা তিনটি ইউনিয়নের লোকজনদের প্রচার করে উত্তেজিত করে তোলা হল? ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে পরিকল্পিত হামলা ও খুন এবং পরবর্তীতে অগ্নিসংযোগের নামে তাণ্ডবলীলাকে নিতান্তই ডাকাতির ঘটনা ও খুন বলে চালানোর চেষ্টা করা হল কোন উদ্দেশ্যে কিংবা কে এই খবর কোচবিহার জেলা প্রশাসনের নজরে আনল—সেটা এক রহস্য!

তবে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশ, ভারতীয় ছিটমহলের (৭৮ গরাতিশাল) শালবাগান এলাকার জাবেদ আলির সঙ্গে একই এলাকার ছিটমহল নাগরিক কমিটির মেম্বার শাহ আলমের বিবাদ দীর্ঘদিনের। এই

এরপর ২৬ পাতায়

বদলে যাচ্ছে মালবাজার !

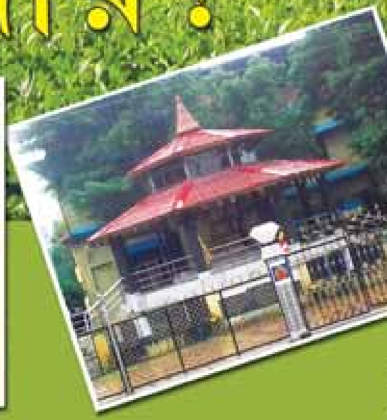

আচ্ছা বলুন তো তুষার শুভ্র হিমালয়ের গা থেকে পিছলে আসা প্রথম সূর্যালোক কোন শহরকে স্নান করিয়ে দেয় সোনালি আলোয়, কোন শহর হাত বাড়ালেই সবুজ কার্পেটের মতো চা-বাগিচার মাঝখান থেকে উড়ে আসা টিয়ার ঝাঁক আকাশের পটে আল্পনা এঁকে দেয় কিংবা নানা ভাষা নানা ধর্ম নানা সংস্কৃতি নানান বর্ণের মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে কোন শহর হয়ে উঠেছে এক ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ? প্রশ্ন অনেক হলেও উত্তর একটাই— মালবাজার।

পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা এবং পুরসভা থেকে মহকুমা শহর— ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া এই শহরকে প্রকৃতি তার অফুরান ঐশ্বর্যে সাজিয়ে তুললে কী হবে স্বাধীনতার পর থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্তও সেই অর্থে উন্নতির আঁচ পায়নি শহর মালবাজার। নামেই পুরসভা বা মহকুমা শহর অথচ পরিষেবা বলতে এই সেদিনও বলার মতো সেরকম কিছুই ছিল না মালবাজারের।

তবে আশার কথা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মালবাজার। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে এসেছেন মালবাজারকে সাজিয়ে তুলতে। আর তাই মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে একদিকে যেমন এগিয়ে এসেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন সংস্থা অন্যদিকে পৌরপ্রধান স্বপন সাহার নেতৃত্বে মাল পৌরসভা। ফলে মাল শহর জুড়ে শুরু হয়েছে উন্নয়ন যজ্ঞ। নিকাশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে শহরের ভেতরের সমস্ত কাঁচা নালা পাকা করার কাজ চলছে। সেই সঙ্গেই প্রশস্ত করা হচ্ছে শহরের সমস্ত রাস্তা। ইতিমধ্যেই থানা মোড় থেকে ঘড়ি মোড় পর্যন্ত মাল শহরের ব্যস্ততম রাস্তা স্টেশন রোড এবং ঘড়ি মোড় থেকে রেলের মাঠ পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বিশেষত পুরনো স্টেশন রোডের তুলনায় বর্তমান রাস্তা যেন রাজপথ। আমূল সংস্কারের ফলে বদলে গেছে ঘড়ি মোড়ও। পুরনো গোবেচারা ঘড়ি মোড় এখন অনেক স্মার্ট, আধুনিক, ঝকঝকে। এরই সঙ্গে জাতীয় সড়কের দু'ধারে ঢালাই করে ফুটপাথ নির্মাণের কাজ যেমন চলছে তেমনি পাশাপাশি জাতীয় সড়কের দু'ধারের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে চলছে হাইড্রেন নির্মাণের কাজও। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে নিউমাল থেকে মাল কলেজ পর্যন্ত উঁচু পথবাতি বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কমিউনিটি হল লাগোয়া বুদ্ধ মূর্তির চতুর্দিকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। বদলে গেছে ক্যালটেক্স মোড়ও। ভাষা আন্দোলন দিবস স্মরণে ক্যালটেক্স

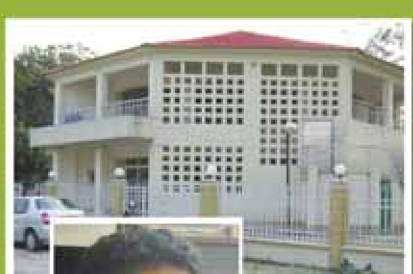

স্বপন সাহা, চেয়ারম্যান, মালবাজার পৌরসভা

উন্নত নাগরিক পরিষেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

মালবাজার পৌরসভা

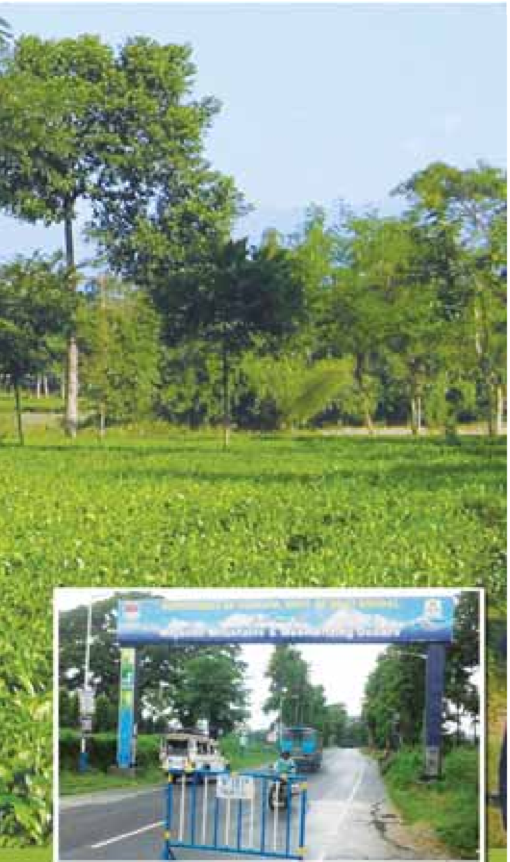

মোড়ে তৈরি হয়েছে ভাষা শহিদ চক। এছাড়া থানা মোড়ে তৈরি হয়েছে আলো, ফোয়ারা এবং সংগীতের সমন্বয়ে লাইভ অ্যান্ড সাউন্ডের ফাউন্টেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পর্যটকের দলও ভীড় জমাচ্ছে আলোকের ঝরনা ধারায় স্নাত হতে। ভাষা শহিদ চকেও প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যাচ্ছে আলো আর জলধারার মোহময় প্রদর্শন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্যালটেক্স মোড়ের যেসব দোকানদারকে ভাষা শহিদ চক তৈরির জন্য উঠে যেতে হয়েছে তাদের পাশের পৌরসভার মার্কেটে বিনামূল্যে দোকানঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একাধিক গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। থানা মোড়ের পৌরসভা পরিচালিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার যেখানে দরিদ্র রোগী কম খরচে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে পারেন আমূল সংস্কারের পরে সেন্টারটি ঝাঁ চকচকে হয়ে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এছাড়া জেলা পরিষদের কাছ থেকে লিজ নিয়ে মাল পৌরসভা মাল বাস স্ট্যান্ডে শপিং মল সহ পরিকাঠামোর নির্মাণের কাজ এবং মাল কলোনির মাঠ সংস্কারের কাজও শুরু করেছে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

যেখানে ঘুমিয়ে আছে ডুয়ার্সের ইতিহাস-সাক্ষীরা

চাইবাসা সমাধিস্থল

নিদ্রিত রয়েছে প্রিয় ঊষার অরুন
রইবে হেথায় চিরনিদ্রায় বিয়োগের গৌরবে।
উঠবে জেগে নবরূপে
ঘুচায়ে সকল ব্যথা,
নও নিঃসঙ্গ, রয়েছে নির্বাক প্রিয়তমা
শিয়রে শায়িতা
জানি, হবে প্রতীক্ষার জয়
যবে যিশুতে তোমার সত্ত্বা বিলীন হয়।।

(অনুবাদ রঞ্জিৎ দত্ত)

আজ থেকে একশো কুড়ি বছর আগে ১৮৯৫ সালের ২৪ জুন মাত্র ২৪ বছর বয়সেই এই পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে যেতে হয়েছিল উইলিয়াম কসকে। তাঁর সমাধির উপরে শ্বেতপাথরের স্মৃতিফলকে ইংরেজি ভাষায় খোদাই করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিল এই নামহীন কবি, তাঁর কোন প্রিয়জন। আজও সেই কবিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় আত্মীয় বিয়োগের ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে সমাধিস্থলের বাতাস। এই পর্যন্ত পড়ে পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন যে কে এই উইলিয়াম কস? কোথায় আছে তার সমাধি? কেনই বা তাকে এত অল্প বয়সে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছিল? এই সমস্ত প্রশ্ন যদি আপনার মনকে অস্থির এবং মস্তিষ্ককে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তবে আপনাকে বেরিয়ে পড়তেই হবে মালবাজার শহর থেকে জাতীয় সড়ক ধরে শিলিগুড়ি অভিমুখে।

মাত্র ২ কিমি এগোলেই পড়বে নিউমাল রেলওয়ে ওভারব্রিজ। যেখান থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে রাঙামাটি চা-বাগানের রাস্তা। সবুজ গালিচা বিছানো চা-বাগিচার বুক চিরে উঁচু-নিচু ঢেউয়ের মতো পথ ধরে যে রাস্তা পেরিয়ে গিয়েছে এই চা-বাগানের একের পর এক ডিভিশন। কবিতার মতো যাদের নাম—স্প্রিং ফিল্ড, সুন্দরী লাইন, চাইবাসা বা রাঙাকোট। চা-বাগানের ফ্যাক্টরি, স্টাফ কোয়ার্টার, শ্রমিক আবাসন পেরিয়ে রাস্তা গিয়ে থেমেছে ওভারব্রিজ থেকে ৫ কিমি দূরের চাইবাসা ডিভিশনে। যার পূর্ব প্রান্তে জনবসতির অদূরে গাঢ় সবুজের মাঝে প্রাচীর ঘেরা প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে রয়েছে

ব্রিটিশরা যখন ডুয়ার্সে চা-বাগানের পত্তন করেন তখন যে সমস্ত ইংরেজ সাহেবরা এই জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে এসেছিলেন চা-বাগানের মালিক হিসেবে বা ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে মৃত্যুর পরে তাদের সমাধিস্থ করবার জন্যই এই সমাধিস্থল নির্মিত হয়।

শ্বেতপাথরে মোড়া এমন এক সমাধিস্থল যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দির নয়ের দশকে স্থাপিত এই সমাধিস্থলে যাঁরা ঘুমিয়ে আছেন তাঁরা কেউই এই দেশের নাগরিক নয়। প্রায় সকলেই ইংরেজ।

ব্রিটিশরা যখন ডুয়ার্সে চা-বাগানের পত্তন করেন তখন যে সমস্ত ইংরেজ সাহেবরা এই জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে এসেছিলেন চা-বাগানের মালিক হিসেবে বা ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে মৃত্যুর পরে তাদের সমাধিস্থ করবার জন্যই এই সমাধিস্থল নির্মিত হয়। সেই সমস্ত চা-বাগানের মালিক, ম্যানেজার অথবা তাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেক হতভাগ্যেরই জীবনতারা খসে গিয়েছিল সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে ভারত নামক তৃতীয় বিশ্বের এক ব্রিটিশ উপনিবেশে। যে উপনিবেশের অন্তর্গত এক প্রদেশ বাংলার উত্তরাংশে হিমালয়ের কোলে হিংস্র জীবজন্তু অধ্যুষিত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি প্রাণঘাতী রোগের আঁতুরঘর ডুয়ার্স নামক এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের রাঙামাটি, সাতখাইয়া, বাগরাকোট, সামসিং বা বড়দিঘি নামে অখ্যাত চা-বাগানের বুকে অকালে যাদের প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছিল তারাই চিরনিদ্রায় শায়িত চাইবাসা সমাধিস্থলে। এখনও যার অসংখ্য চিহ্ন বহন করে চলেছে ভগ্নপ্রায় এই সমাধিস্থল। এখনও রয়ে গিয়েছে প্রিয়জনের স্মৃতিতে তৈরি বেশ কিছু নির্মাণ। যেমন ডব্লিউ ডি কৌল তার উনপঞ্চাশ বছর এগারো মাস তিনদিন বয়সি স্ত্রী মারিয়ান ইডার স্মৃতিতে তার কবরের উপরে তৈরি করেছিলেন এক অপরূপ সুন্দরী শ্বেতপাথরের পরী। যার হাত দু'টো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হলেও অক্ষত আছে ডানা জোড়া। যেন একটি পাখা মেলে উড়ে যাবে আকাশে। কেউ আবার প্রিয়জনের উদ্দেশে লিখেছেন মর্মস্পর্শী কবিতা। এই লেখার শুরুতেই যার উল্লেখ রয়েছে। তবে আশচর্যের বিষয় এদের বেশিরভাগেরই মৃত্যু হয়েছিল অনেক কম বয়সে। কেউ উনপঞ্চাশ, কেউ তেত্রিশ, কেউ উনচল্লিশ আবার কেউ চলে গিয়েছিলেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে। সম্ভবত ডুয়ার্সের মারণ রোগ কালাজ্বর, ম্যালেরিয়াই তাদের অকাল মৃত্যুর কারণ। কেউ তার প্রেয়সীকে কেউ বা তাদের একমাত্র পুত্রকে এই সমাধিস্থলে চিরশায়িত রেখে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। যেমন লিসরিভার চা-বাগানের অ্যান্ডারসন দম্পতির একমাত্র পুত্র, মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই যার মৃত্যু হয় সেই জেমস ইনসো অ্যান্ডারসনকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। আবার সাত খাইয়া চা-বাগানের ফ্রেডরিক চার্লস জর্ডন ১৯২৩ সালের ১৮ নভেম্বর মাত্র পঁচিশবছর বয়সেই কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার পর তার মরদেহেরও ঠাঁই হয়েছিল নিজের জন্মভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের রাঙামাটি চা-বাগানের চাইবাসা সমাধিস্থলে। বড়দিঘি চা-বাগানের সুইনটন থমাস আগাসিই সম্ভবত শেষ ইংরেজ, মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ১৯৬৮ সালের ৬ মার্চ মৃত্যুর পর এই সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়।

এমন এক ঐতিহাসিক সমাধিস্থল রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে করুণ দশা। সীমানা প্রাচীরের গায়ে শ্যাওলার পুরু আস্তরণ জমেছে। সমাধিস্থলের প্রবেশ দ্বারটির ছাদে, দেয়ালের গায়ে এবং সমাধিগুলির গায়েও দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করায় ধুলো-ময়লা-শ্যাওলার মিশ্রণে পলেস্তারা পরে গিয়েছে। প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্বেতপাথরে খোদাই করা কবিতা বা লেখার পাঠোদ্ধার করাই প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শিবহরি নেওয়ার, চন্দ্রশেখর পুরীদের কাছ থেকে জানা গেল আগে এই সমাধিক্ষেত্রের ভেতরে প্রচুর ঔষধী গাছ ছিল। বর্তমানে যার কোনও অস্তিত্ব নেই। অথচ মালবাজারকে কেন্দ্র করে পর্যটনের বিকাশে যেভাবে উদ্যোগী হয়েছে বর্তমান সরকার এবং মাল পুরসভা তাতে ডুয়ার্স বেড়াতে আসা অসংখ্য পর্যটকের কাছে অন্যতম দ্রষ্টব্য হয়ে উঠতেই পারে ইংরেজ সাহেবদের এই সমাধিক্ষেত্র। শুধু তাই নয়, বিদেশি পর্যটকদের কাছেও ডুয়ার্স ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে এই সমাধিক্ষেত্র।

এই প্রসঙ্গে মাল বিধানসভার বিধায়ক বুলু চিক বরাইক যিনি রাঙামাটি চা-বাগানেরই বাসিন্দা এবং ছেলেবেলা থেকেই ওই সমাধিস্থলের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল তিনিও চাইবাসা সমাধিস্থলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তথা পর্যটকদের সামনে পশ্চিম ডুয়ার্সের অন্যতম দ্রষ্টব্য হিসেবে এই সমাধিস্থলকে তুলে ধরার বিষয়ে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে একমত। দ্রুত তিনি এই বিষয়ে রাঙামাটি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। এখন দেখার, কত তাড়াতাড়ি ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিতে পারে রাঙামাটি চা-বাগানের চাইবাসা সমাধিস্থল।

সুধাংশু বিশ্বাস

জল্পেশে জল

মাথায় প্রায় হাত দিয়ে ফেলেছিলেন জল্পেশ কমিটি এবং ব্যবসায়ীরা। এবার পাঁচ-পাঁচটা রবিবার পড়েছে শ্রাবণ মাসে। অথচ প্রথম তিন রবিবারে লোক কই? বাবার মাথায় জল ঢালায় কি ভাঁটা পড়ল? তদন্ত করে জানা গেল বিচিত্র কারণে লোক কম। বাবার মাথায় ঢালা জলই নেই তিস্তা নদীতে। বর্ষা তো তখন আটকে দক্ষিণ বঙ্গে। ফলে তিস্তায় ধূ ধূ। পূব পাড়ে দাঁড়ালে জল দেখা যায় ওই দূরে। স্নান করা তো দুরস্ত, এক ঘটি আনতেই অবস্থা করুণ হচ্ছিল ভক্তদের। শেষে অবশ্য বর্ষা ফিরে আসায় স্বস্তি। তিস্তায় দু'কূল ছাপানো জল হতেই জমে উঠেছে জল্পেশের শ্রাবণী মেলা। কমিটির মুখে হাসি। ব্যবসায়ীরাও খুশি।

রাত বিরেতে নো অসুখ

রাতে যাতে শরীর বেগড়বাই না করে সেজন্য দরকারে যজ্ঞ করার কথা ভাবছে মাদারিহাটের মানুষ। রাতে ঘুমের সময়। রোগ জীবাণুদের সেটা বোঝা উচিত। মাদারির মানুষ অনেক চেষ্টা করেছেন রাতে অসুস্থ না হওয়ার জন্য। কাজ হচ্ছে না বলেই যজ্ঞের ভাবনা। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা গোলমেলে শোনালেও উপায় নেই। কারণ মাদারিহাটে রাতে ১১টার পর ওষুধ মেলে না। প্রেসক্রিপশন নিয়ে রাতে ওষুধ মালিকদের দোকানে-বাড়িতে কামান দাগলেও মেলে না। ফলে কড়ি ফেলে দৌড়োতে হয় বীরপারাড়ায়। মাদারির ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অবশ্যই আছে। কেবল সেখানে কোনও ডাক্তার পাঠানো হয়নি। এযুগে চালক ছাড়া বিমান উড়লেও বিনে ডাক্তারে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলে কিনা জানে না মাদারিবাসী। এই অবস্থায় রাতে অসুখ বাঁধিয়ে বিপদে পড়ার কোনও মানে থাকে? তাই যজ্ঞের ভাবনা।

শুষ্কতায় স্বস্তিতে জলপাই

জলপাইগুড়ি শহরে তেমন বৃষ্টি হচ্ছে না। করলাও তাই মাঝে মাঝে ফুলে উঠলেও এখনও ডোবায়নি। আসলে ফি বছর শ্রাবণ মাসে করলার জল শহরে ঢুকে অনেকগুলি পুর ওয়ার্ডে গোলমাল বাঁধাবে, এটা ওইসব ওয়ার্ডের পুর সদস্যরা ধরেই রাখেন। জল ঢুকলেই ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ সহ হাঁটু-কোমর-বুক জলে ছোটাছুটি করাটা তাঁদের ফি বছরে দায়িত্ব। এবার অগাস্ট প্রায় পেরিয়ে গেলেও তেমন না ঘটায় তাঁরা কিঞ্চিৎ স্বস্তিতে। ভাবছেন, এবার হয় তো বেঁচে গেলাম। কিন্তু সেপ্টেম্বরেও যে এমনটা ঘটতে পারে তা ভুলছেন না অভিজ্ঞ সদস্যরা। আশায় আছেন, তেমন কিছু হবে না।

দরওয়াজা ওপেন হ্যায়

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের নীল-সাদা বাসগুলির দরজা নিজে থেকেই বন্ধ হয়। নইলে বাস চলে না। এমন চমকদার বাস পাওয়ার পর অভিজ্ঞ যাত্রীরা অপেক্ষায় ছিলেন কবে বিগড়ে যাবে। কারণ সরকারি বাসের নিয়তিই হল খারাপ থাকা। এতদিনে তাঁদের আশ মিটেছে। বেশ কয়েকটা বাসের মূল দরজা বন্ধ হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মালবাজার রুটে এমন একখানা ওপেন ডোর বাসে উঠে একজন জানতে চাইল, 'দরজা সারাবে কবে?' শুনে পেছন থেকে কে জানি বলল, 'আগে দু'একজন চলন্ত বাস থেকে পড়ুক তারপর ভাবা যাবে।'

সীমান্তে পেঁয়াজি

ডুয়ার্সের বাংলাদেশ সীমান্তে ওপার থেকে এ পারের চেনাজানাদের পেঁয়াজ ছুঁড়ে পাঠাচ্ছেন বলে জানা গেল। কারণ, ডুয়ার্সে পেঁয়াজ যখন প্রায় সত্তর টাকা, ও পাড়ে তখন ঠিক অর্ধেক। চাউলহাটির লুৎফর রহমান তেমন পেঁয়াজ পেয়ে রেঁধে খেয়েছেন। তিনি অবশ্য জানেন যে পেঁয়াজ ওপারে যায় এ পার থেকেই। কেবল জানেন না, দাম কেন ওপারে আধা। সত্যিই এক জটিল রহস্য দাদা!

ব্যতিক্রমী রক্তদান

কোনও ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আয়োজিত নিছক একটি রক্তদান শিবিরের রিপোর্ট নয়, এটি কোচবিহারের একটি দোকানের কর্মচারীদের আয়োজিত শিবির। শহরের অন্যতম প্রাচীন বিপণি লক্ষ্মীনারায়ণ বস্ত্রালয়ের কর্মীরা বছরভর সকাল থেকে সন্ধে হাড়ভাঙা খাটুনির পর সমাজের প্রতি সামান্য দায়বদ্ধতা হিসেবেই গত তিনবছর ধরে এই উদ্যোগ নিচ্ছেন। গত ১৫ অগাস্ট ধর্মসভা প্রাঙ্গনে হয়ে গেল এ বছরের শিবির। রক্ত দিলেন শহরের ৩৯ জন নাগরিক, এমনকি নিজেরাও। শিবিরের যাবতীয় খরচ আর উৎসাহ জোগান বস্ত্রালয়ের কর্ণধার প্রবীরবাবু। সবার বক্তব্য এক, 'রক্ত দিলে মনটা ভীষণ হালকা হয়ে যায়, মনে হয় নিজেকে কিছু দিলাম।'

পদ্মার ইলিশ খেতে চলুন ডুয়ার্স

ইলিশপ্রেমী বাঙালি পদ্মার তুলনাহীন ইলিশ মাছের স্বাদ নিতে হলে উঠে পড়ুন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে। সঙ্গে সাড়ে সাতটায় শেয়ালদা থেকে ছেড়ে রাত পেরোলেই কোচবিহার। বর্ষার প্রকৃতির অনবদ্য রূপ দেখতে দেখতে চলুন দিনহাটা কিংবা সিতাই বা শিতলকুচি। কিংবা চ্যাংরাবান্ধা। ছিটমহলের খবর পড়ে পড়ে ক্লান্ত? একবার না হয় চোখের দেখা দেখে নিন ওপার বাংলা, তিনবিঘা, ছিট। আর নিজের রসনাকে তৃপ্ত করুন পদ্মার ইলিশে। সেখানকার বাজারে এখন উঠছে ইয়াব্বড় সব ইলিশ, কোনও কোনওটার ওজন আড়াই-তিন কিলো দাঁড়াচ্ছে, ভাবতে পারেন। না দাম কলকাতার মতো আকাশছোঁয়া নয় মোটেও, আর স্বাদের তুলনা করাটাও বোধহয় বালখিল্যতা হয়ে যাবে। হাতি-গন্ডার-জঙ্গল-পাহাড় ছেড়ে ডুয়ার্স যে ইলিশের জন্য এমন ফেমাস হয়ে যাবে তা কে জানত! জয় বাংলার জয়।

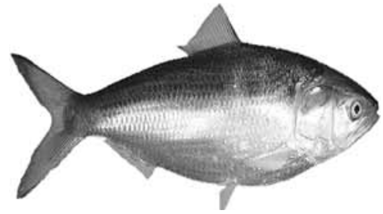

EXPERIENCE
Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA

www.wbtdc.gov.in

মূর্তি টুরিস্ট লজ

- জঙ্গল সাফারি
- ট্রাইবাল ডান্স
- বন ফায়ার
- হ্যান্ডিক্রাফট সেলস কাউন্টার
- এসি কনফারেন্স হল
- লোকাল সাইট সিইং
- কার হায়ার

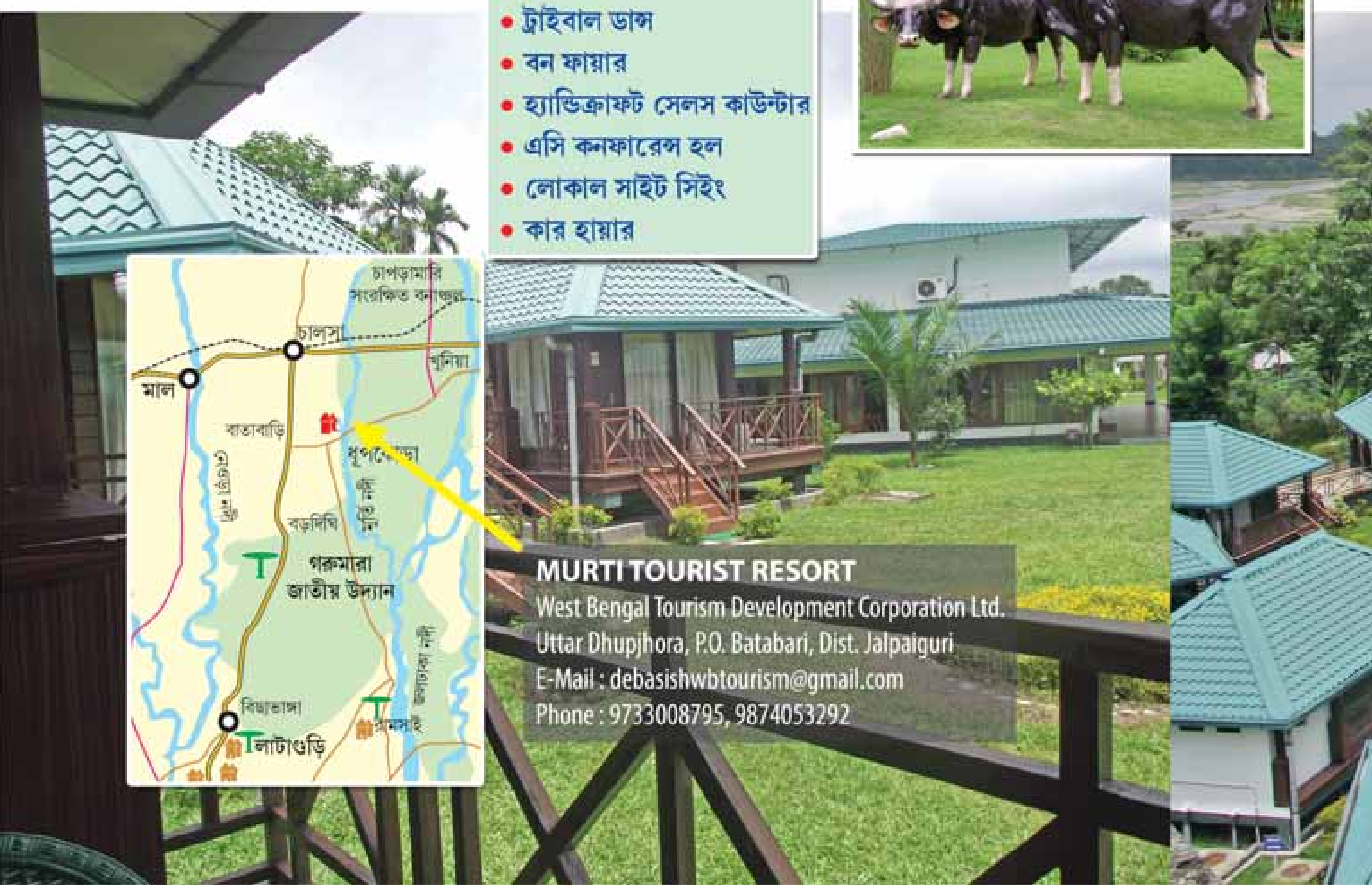

MURTI TOURIST RESORT

West Bengal Tourism Development Corporation Ltd.
Uttar Dhupjhora, P.O. Batabari, Dist. Jalpaiguri
E-Mail : debasishwbtourism@gmail.com
Phone : 9733008795, 9874053292

JALDAPARA TOURIST RESORT
West Bengal Tourism Dev. Corp. Ltd.
P.O. Madarihat, Dist. Alipurduar
E-Mail : jaldaparatouristlodge2015@gmail.com
Phone : 9733008795, 03563-262230

জলদাপাড়া টুরিস্ট লজ

- এলিফ্যান্ট রাইড
- জিপ সাফারি
- বন ফায়ার
- লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো
- ওয়াইল্ড অ্যানিমেল মুভি শো
- লোকাল সাইট সিইং
- কার রেন্টাল

যাঁরা বলেন বা ভাবেন এ রাজ্যে সরকারি দপ্তরগুলিতে ওয়ার্ক কালচার বলে কিছু নেই কিংবা যাঁরা ভাবেন ছুটিতে ডুয়ার্স বেড়াতে গিয়ে ডজন ডজন রিসর্ট মিললেও সঠিক মানের পরিষেবা মেলা কঠিন, তাঁদের ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের জলদাপাড়া এবং মূর্তি টুরিস্ট লজে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেলে। এমনটাই দাবি রিসর্ট ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহার। দুটি লজেই প্রত্যেক মরসুমে বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা। কেবল ভাল থাকা ও খাওয়াই নয়, সেই সঙ্গে সাফারি, আদিবাসি নৃত্য, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, সাইকেল ভাড়া করে আশেপাশে ঘুরে দেখা, ইন্টারনেট, বাচ্চাদের জন্য ভিডিও গেম— সব মিলিয়ে এ রাজ্যের পর্যটনে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে ডুয়ার্সের দুই প্রান্তের এই দুই রিসর্ট।

ছিটমহলের ছেঁড়া কথা

১৯ পাতার পর

বিরোধের জেরে রমজান আলি হত্যাকাণ্ডের একদিন আগে শাহ আলম তাঁর বাড়ি ছিটমহল থেকে বাংলাদেশে সরিয়ে নেয়। এছাড়াও সে জাবেদ আলিকে 'দেখে নেবার' হুমকি দেয়। অভিযোগ শাহ আলম মেম্বার জমি দখল ও জাবেদ-সহ ৫ জনকে খুনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশি রমজান, ইয়াসিন রনজু ও টাইফুন সহ ২০-৩০ জনের একটি দলকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে। পরিকল্পনা কার্যকরী করতে তারা নাকি ছিটমহলের শালবাগান এলাকার জনৈক সৈয়দ জামানের বাড়িতে গোপন বৈঠকও করেন। তারপরেই ছক কষে বৃহস্পতিবারের হামলা।

শুধুই কি জাবেদ আলির জমি দখল ও তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা? কিন্তু ঘটনা প্রবাহ যা ইঙ্গিত দেয় তা হল, গরাতিশাল ছিটমহলে হামলা, খুন, লাশ না দেওয়া, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদি ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে ছিটমহলের নাগরিক কমিটি গঠন নিয়ে বিবাদমান দুটি গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের কোন্দল, জমিদখল সহ আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতি। স্থানীয়ভাবে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এর আগেও নাকি সেখানে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। বিবাদমান ও শাহ আলম মেম্বার এবং অপরদিকে জাবেদ আলি ও আইয়ুব আলি। উভয়পক্ষে রয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির কোনও না কোনওটির সাহচর্য। তবে এই পর্বে বাংলাদেশের পত্রিকা যখন অভিযোগ করে বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও একজন কী করে ছিটমহলের চেয়ারম্যান হন তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে প্রকৃত ছিটবাসীরা প্রকৃত অর্থেই সংখ্যালঘু এবং সেখানে কাদের রাজত্ব চলছে। মফিজার জামায়েত করেন এবং বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে ছিটমহলের অভ্যন্তরে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির চালান। যদিও মফিজার তা অস্বীকার করেন।

এর পাশাপাশি একবছর পরে ওই পত্রিকায় 'নাগরিকত্বের দাবিতে ছিটমহলবাসীদের অনশন' শীর্ষক এক সংবাদে দেখা যায় যে, ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি আয়োজিত এই অনশন মঞ্চের অন্যতম নক্ষত্র হলেন গরাতি ছিটমহলের চেয়ারম্যান মফিজার রহমান। বুঝতে অসুবিধা হয় না ভারতীয় ছিট মহলগুলিতে আজ কাদের রাজত্ব! প্রকৃত ছিটবাসীরা আজ প্রকৃত অর্থেই সংখ্যালঘু। গরাতিশাল একটি উদাহরণমাত্র।

(পরবর্তী সংখ্যায়)

দেবব্রত চাকী

পাঠকের ডুয়ার্স

হ্যামিল্টনগঞ্জ : শত সমস্যাতেও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল

আলিপুরদুয়ার জেলা শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে এবং ভুটান থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরত্বে ডুয়ার্সের হ্যামিল্টনগঞ্জ। যার নামকরণের মধ্যেই রয়েছে ব্রিটিশ গন্ধ। প্রায় ২২টি চা-বাগান রয়েছে হ্যামিল্টনগঞ্জকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে চুয়াপাড়া অন্যতম। তাই চুয়াপাড়া চা-বাগানে ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হ্যামিল্টন একটি ইঞ্জিনচালিত ট্রলিলাইন সৃষ্টি করেন। যেখান থেকে চা-বাক্সগুলি এনে একটি গোডাউনে সংরক্ষিত রাখা হত, আবার পরদিন সকালে টি ডেসপ্যাচিংয়ের জন্য কলকাতায় পাঠানো হত। এই সাহেবের নামানুসারে কালচিনি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এর নাম হয় হ্যামিল্টনগঞ্জ। এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে ওঠে হ্যামিল্টনগঞ্জ রেলস্টেশন।

আমাদের মূল প্রশ্ন হল এখন হ্যামিল্টনগঞ্জ কোথায় দাঁড়িয়ে। এখানকার উন্নতি, অবনতি, অচলাবস্থা, সমস্যা এসব কিছু নিয়ে 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিনিধি হয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের মুখোমুখি হই। তাদের কথায় হ্যামিল্টনগঞ্জের প্রথম সমস্যা পানীয় জলের। স্থানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থায় হ্যামিল্টনগঞ্জ ভীষণভাবে পিছিয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে কলের লাইন পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। যারা জল পাচ্ছেন তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাচ্ছেন না। হ্যামিল্টনগঞ্জের একজন ব্যবসায়ীকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বলেন, এখানকার জলের সমস্যা অনেকদিনের পুরনো। সুরাহা এখনও হয়নি।

সরকার ২০১১ সালে একটি জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় জল সরবরাহের সুবিধার জন্য, তা কালের গভীরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অর্থাৎ কোনও উদ্যোগ আর নেওয়া হয়নি। তাই যারা একটু অবস্থাসম্পন্ন মানুষ তারা পাম্পের সাহায্যে জল নিচ্ছেন। আর যারা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ তাদের জল আনতে দূরে কোনও

সরকার ২০১১ সালে একটি জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় জল সরবরাহের সুবিধার জন্য, তা কালের গভীরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অর্থাৎ কোনও উদ্যোগ আর নেওয়া হয়নি। তাই যারা একটু অবস্থাসম্পন্ন মানুষ তারা পাম্পের সাহায্যে জল নিচ্ছেন।

হ্যামিল্টনগঞ্জের পুরনো স্মৃতির মধ্যে উল্লেখ্য হল নাটমন্দির। এই মায়ের মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর মেলা বসে। এই মেলা এবছর ৮০ বছরে পা দিল। এই মেলা হ্যামিল্টনগঞ্জের এক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এই মেলায় অংশ নেন।

টিউবঅয়েলে যেতে হচ্ছে। এই সমস্যার সংস্কার করতে হলে সরকারের স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এখানকার স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়ে এখানকার বাসিন্দারা ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। তারা বলেন এখানকার একটিমাত্র সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র উত্তরলতাবাড়ি। যেখানে কোনও অপারেশন থিয়েটার নেই। কোনও এক্স-রে, ইউ.এস.জি করার মেশিন নেই। কোনও জটিল ডেলিভারির ক্ষেত্রে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে যন্ত্রপাতি নেই। জরুরি চিকিৎসায় কোনও রোগী এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে রেফার করা হয় আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে। এখানকার হাসপাতালটি বড় করা খুব প্রয়োজন, ওয়ার্ডগুলি অত্যন্ত ছোট, কেবিনের সংখ্যাও ভীষণ কম। যদি এখানে আরেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগ নেওয়া হয় তবে হ্যামিল্টনগঞ্জ বাসীদের সুবিধা হয়।

হ্যামিল্টনগঞ্জ মূলত ব্যবসাকেন্দ্রিক এলাকা। এখানকার প্রায় শতবছরের পুরনো রবিবারের হাট। বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে হ্যামিল্টনগঞ্জ। সমস্ত বাগান থেকে এবং আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, রাঙালিবাজনা, মাদারিহাট, ফালাকাটা, হাসিমারা, জয়গাঁ, বক্সা বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্রেতা বিক্রেতারা আসেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নতি সাধন করেছে হ্যামিল্টনগঞ্জ। কিন্তু এখানে বর্ষার দিনে যে পরিমাণ জল জমে তা অনেক ব্যবসায়ীদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু হাটবাজারের দিনেই নয়, অন্যান্য দিনেও নিকাশি ব্যবস্থা এখানকার বাসিন্দাদের নাজেহাল করে ছেড়েছে। বর্ষায় বেশি বৃষ্টিপাত হলেই প্রায় হাঁটু অবধি জলে হাঁটতে হয়। ২০১৪ সালে একটি উদ্যোগ সরকার নেয়— বৃষ্টির জল যাতে রাস্তাঘাটে না জমে, নিকাশির সাহায্যে নদীতে গিয়ে পড়ে, কিন্তু সঠিক প্রয়োগের অভাবে হ্যামিল্টনগঞ্জ তাতে কোনওভাবেই লাভবান হয়নি।

হ্যামিল্টনগঞ্জ চা-বাগান সমন্বিত এলাকা। সাধারণ মানুষকে এখানে ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। হ্যামিল্টনগঞ্জে একটিমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। প্রচুর মানুষকে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়। এতে বিরাট সমস্যা তৈরি হয়। তবে এটিএম পরিসেবার ক্ষেত্রে এখানে সুবিধা হয়েছে।

হ্যামিল্টনগঞ্জের পুরনো স্মৃতির মধ্যে উল্লেখ্য হল নাটমন্দির। এই মায়ের মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর মেলা বসে। এই মেলা এবছর ৮০ বছরে পা দিল। এই মেলা হ্যামিল্টনগঞ্জের এক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এই মেলায় অংশ নেন। দুর্গাপুজোর পর এটি একটি উৎসবের আমেজ জাগিয়ে তোলে। প্রায় ১২ দিন ধরে সারারাতব্যাপী এই মেলা চলে। আগে এই মেলাটি বেশ কয়েকটি প্রাঙ্গণ জুড়ে হত, কিন্তু সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের সংখ্যা কমে গিয়েছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ভয়ঙ্কর ভিড় সৃষ্টি হচ্ছে। মেলা শেষ হয়ে যাবার পর যে পরিমাণ প্লাস্টিক, বিভিন্ন বর্জ্যপদার্থ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকছে তাতে দুষণ সমানে বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কালীপূজা কমিটিকে আরও উদ্যোগী ও সচেতন হতে হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে হ্যামিল্টনগঞ্জ ইতিমধ্যেই সাড়া জাগিয়েছে। হ্যামিল্টনগঞ্জ এবং কালচিনিতে বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ বসবাস করায় বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা, নেপালি এবং হিন্দি তিনটি ভাষা মাধমেই পঠনপাঠন চালু রয়েছে। কিন্তু এখানকার বাংলা ভাষাভাষির মানুষ অধিক হওয়ায় বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় বলতে ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি কালচিনি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ছাড়া আর কোনও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। ফলে মাধ্যমিকের পর হ্যামিল্টনগঞ্জের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। সম্প্রতি হ্যামিল্টনগঞ্জ জুনিয়র স্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল করা হয়।

পর্যটন পরিকাঠামোর দিক দিয়ে হ্যামিল্টনগঞ্জ আজও অনুন্নত। পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা এখনও ভালভাবে গড়ে ওঠেনি। যাও বা একটি গেস্টহাউস আছে, তাতে ১০ জনের বেশি মানুষ থাকতে পারে না। এলাকার মানুষ চান মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন— হ্যামিল্টনগঞ্জের মতো চা-বাগানও পাহার ঘেরা জায়গা পর্যটন শিল্পে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। হ্যামিল্টনগঞ্জের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাকেও ভাল করতে হবে। আলিপুরদুয়ার থেকে জয়গাঁ অবধি যে বাসগুলি চলাচল করে একটি সরকারি বাস ছাড়া বাকি সব পাবলিক বাস। হাসিমারা ও জয়গাঁ যেতে গেলে বাসরা নদীর উপরে ব্রিজটি পার করতে হয় সেটি ২০১০ সালে প্রবল জলস্রোতে ভেসে পড়েছে। গত ৪ বছরে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি এটি সংস্কারের। শুধুমাত্র ডাইভার্সানের দ্বারা মালবোঝাই বিভিন্ন লরি এবং অন্যান্য গাড়ি ভুটান ও জয়গাঁ সীমান্তে যাতায়াত করে। বর্ষার দিনে এই নদীর জল ডাইভার্সানের উপর দিয়ে বইতে থাকে। এখানে রেল যোগাযোগের উপর অনেকেই ভরসা করেন। প্যাসেঞ্জার, ডি.এম.ইউ, ইন্টারসিটি ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা ছিল। সম্প্রতি দূরপাল্লার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের স্টপেজ পেয়ে উপকৃত হয়েছে হ্যামিল্টনগঞ্জ।

হ্যামিল্টনগঞ্জ— নামের মধ্যেই এক ঐতিহ্যের হাতছানি। সাবেকি ডুয়ার্সকে জানতে হলে তাই ছুটতে হবে এই জনপদে। চারদিকে চা-বাগান আর অরণ্যের মায়াজাল। পা বাড়ালেই প্রতিবেশী বিদেশ। হ্যামিল্টনগঞ্জ চায় নিজের পরিচয়েই মাথা তুলে দাঁড়াতে।

পৌলোমী গঙ্গোপাধ্যায়

ডাকছে ডুয়ার্স

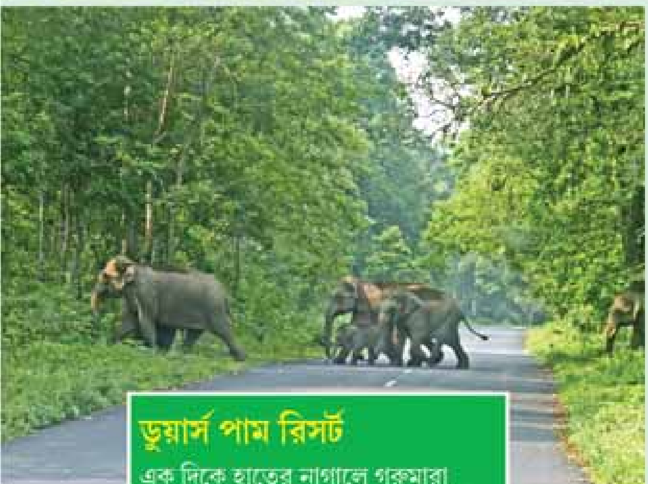

ডুয়ার্স পাম রিসর্ট

এক দিকে হাতের নাগালে গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের গেট, অন্য দিকে খানিক এগোলেই মূর্তি পেরিয়ে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য। চালসা-ময়নাগুড়ি হাইওয়ের উপরেই এক ফালি চা বাগানের মধ্যিখানে এই রিসর্টে পৌঁছনো বোধহয় সবচাইতে সোজা। শিলিগুড়ি, মালবাজার, আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহার যে কোনও প্রান্ত থেকেই পৌঁছতে সময় লাগে দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা। বছরভর একই রকম উদ্দীপনা ও আতিথেয়তা নিয়ে খোলা থাকে এই রিসর্ট। শহরের মানুষদের জন্য নিরাপদে থাকা, খাওয়া ও প্রকৃতিকে উপভোগ করার একটি আন্তরিক আয়োজন। কেবল পুজো বা বড়দিন কিংবা দোলের ছুটিতেই নয়, যে কোনও উইকএন্ডে পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে থাকলে ডুয়ার্স পাম রিসর্ট হতে পারে আপনার পছন্দের ঠিকানা।

Registered under West Bengal Tourism Dept. (Govt. of West Bengal) & Authorised by West Bengal Forest Development Corporation

DOOARS
PALM RESORT

LODGING | FOODING | PACKAGE TOUR

• Comfortable Rooms (AC/Non-AC) • Running Hot & Cold Water
• Multi Cuisine AC Restaurant • Conference Hall

Centrally located between Gorumara NP & Chapramari WLS

East Batabari, Chalsa, Dist. Jalpaiguri
Phone: 9775065000, 9775265000, 9775365000
Mail: dooarspalmresort@gmail.com

ধারাবাহিক কাহিনি

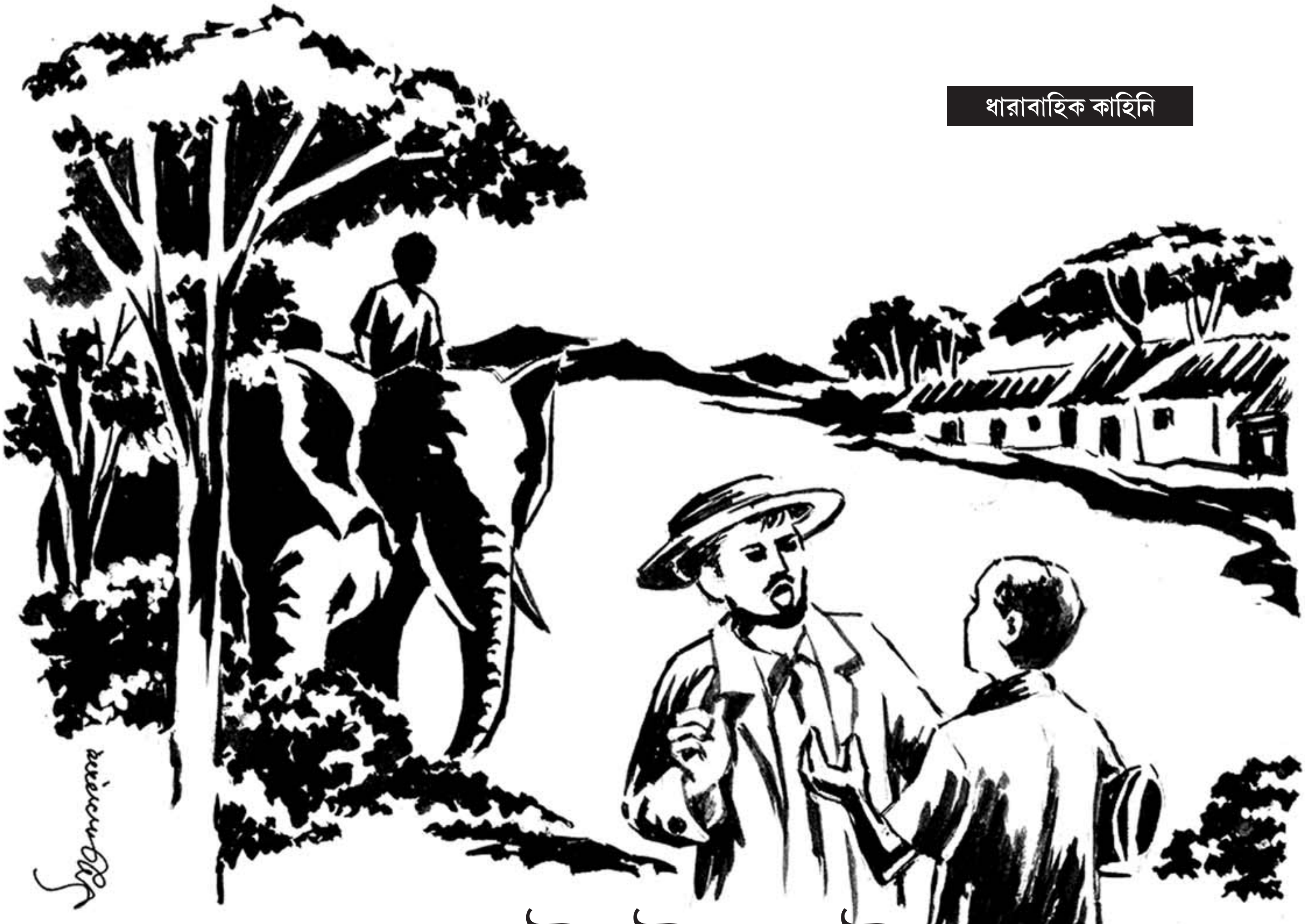

তরাই উৎরাই

৯

সুভাষ বসুর সভায় যোগ দিতে হিদারু রায়ের আত্মীয়রা এসেছিল শহরে। আত্মীয়কে 'সাগাই' বলে রাজবংশীরা। হিদারুর বাড়িতে তাঁরা ভাইবোন ভাস্তাভাস্তি মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ জন। সাগাই এসেছে জনা পাঁচেক। এরপরেও তো ফি রোজ আট-দশ জন খেতে আসে। ফলে দু'বেলাই হিদারুর বাড়িতে উৎসবের আবহাওয়া। মাঝে মাঝে এটা-সেটা পুজো-পার্বণের অনুষ্ঠানে আবহাওয়া যে আরও জম্পেশ হয়ে ওঠে, সেটা বলাই বাহুল্য। সভায় যোগ দিতে যারা এসেছিল তাঁরা কয়েক দিন শহরে কাটিয়ে ফিরে যাবে দোলের পরপর। বাড়িতে এই মুহূর্তে রোজ সন্ধ্যায় জমিয়ে আলোচনা সভা বসলেও হিদারু একটু এড়িয়ে যাচ্ছিল সে সব। আজকেও যেত, কিন্তু সকালেই বাবা বলে দিয়েছে যে, বিষয়টা জরুরি। হিদারু যেন ভুলে না যায় সে রাজবংশী।

হিদারু অবশ্য জানে যে বিষয়টা ঠিক কী? সাগাইদের একজন ক্ষত্রিয় সমাজের সদস্য। আলোচনা হবে তাঁরই উদ্যোগে। শহরের রাজবংশীদের অনেকেই আসবে আজ হিদারুর বাড়িতে। সেই উপলক্ষ্যে খাওয়া-দাওয়ার মেলা আয়োজন করেছে তাঁর পরিবার। তিস্তার বোরলি মাছ নেওয়া হয়েছে প্রায় তিন সের। যত্ন করে বানিয়ে শুকিয়ে রাখা সিদলের বড়ি দু'দিন ধরে আবার রোদ্দুরে দেওয়া হচ্ছে। পাঁঠা কাটবে বলে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বাড়ির পেছন দিকে। হিদারুর পরিবারে এখন সুবাতাস। বাপ-দাদারা একের পর এক জমি কিনছে। কাঠের ব্যবসায় ঢুকেছে। চা-বাগানেরও শেয়ার কেনার কথা ভাবছে। হিদারু চাইলেই কোনও একটা বাগানের আপিসে ঢুকে যেতেই পারে। পরিবারের তেমন জানাশোনাও রয়েছে, কিন্তু হিদারুর তাতে মন নেই। এ নিয়ে হিদারুর বাপ একটু চিন্তিত। সে চিন্তা অবশ্য হিদারুর উপার্জন নিয়ে নয়। হিদারুর খাওয়া-পড়ার অভাব নেই। তবে পরিবারে সে-ই একমাত্র লেখাপড়া জানে। খানিকটা ইংরেজিও। এটার বিনিময়ে নগদ টাকার চাকরি সে কেন নিচ্ছে না—সেটা স্পষ্ট নয় বলেই চিন্তিত থাকে তাঁর বাপ-দাদারা। কংগ্রেস করছে ভালো কথা। তা কংগ্রেস করলে কি চা-বাগানে আপিসে চাকরি করা যায় না? ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ট্যাঁকে নগদ কিছু থাকলে তো সুবিধা। শহরের কংগ্রেস লিডারদের দেখ! বেশিরভাগই উকিল। সভাপতি তো একজন রাজা। হিদারু তেমন না হলেও বাগানের আপিসে চাকরি করে কিছু টাকা পেয়ে কংগ্রেস করলে হিদারুও খানিকটা লিডার হতে পারে।

অবশ্য এমনটা ছিল না হিদারু। তাঁর বাপ এটাও ভাবে। তারিণীবাবু বলেছিলেন, হয়ে যাবে। হয়েও যেত কাজটা। তখন থেকেই ছেলের মাথায় ঢুকল কংগ্রেসের ভূত। অবশ্য 'ভূত' কথাটা পরিবারের সকলের মনে একটা গর্ব আর স্নেহ মেশানো ভাবও যে নিয়ে আসে, সেটাও বোঝেন তিনি।

তবে, আজকের আলোচনার বিষয় অবশ্য হিদারুর কংগ্রেস করা নয়। হিদারু জানে কী নিয়ে আলোচনা হবে। সন্ধ্যায় যখন ভাড়া করা

‘এরা দেশি মানুষের সমস্যা কী বুঝবে? এরাই তো খাজনা আদায়ের নামে অত্যাচার করতে শুরু করেছে। দেশি মানুষদের অপমান করতে শিখেছে। এখন যা কিছু ক্ষমতা বলো, সব ওই ভাটিয়াদের হাতে। সাহেব বলো, ম্যাজিস্টর বলো... ওদের কথাই শোনে।’

পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে, হিদারুদের বাড়ির সামনে সোয়া এক বিঘের উঠোনে আলোচনা শুরু হল, তখন সাগাইদের হোতা, বিশুয়া রায় বলতে শুরু করলেন সেই বিষয়টি। সে শুরু করেছে একটা বিশেষ ঘটনা দিয়ে যেটা ঘটার সময় হিদারু ছিল বালক। হিদারু মনে করতে পারে একটা মাঘ মাসের কথা। শয়ে-শয়ে রাজবংশী পুরুষ দেবীগঞ্জে রওনা দিচ্ছিল বিশেষ একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। পঞ্চানন ঠাকুরের উদ্যোগে তাঁরা যাচ্ছিল পৈতে ধারণ করে ক্ষত্রিয় হতে। হিদারুর পরিবার অবশ্য যায়নি দেবীগঞ্জে। কারণ, পৈতে গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা রীতির কথা উল্লেখ করে দিয়েছিলেন ঠাকুর। হিদারুর বাপের কাছে সেসব খুব একটা ভাল ঠেকেনি। হিদারু যখন পরে জেনেছে সেই বিশেষ ঘটনাটা তখন তাঁরও পছন্দ হয়নি।

অপছন্দের কারণটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের রাজবংশী সমাজে মেয়েরা মোটেই ভাটিয়াদের মতো ঘরের ভেতরে থাকে না। কাজকর্মে বের হতে গেলে দু'টো পুরুষের সঙ্গে কথা হবে, এটা তো স্বাভাবিক। তাঁদের পাশের বাড়ির বোসেদের বউ তো চারদিকে ঢাকা ঘোড়ার গাড়ি চেপে কালিবাড়িতে যান। শহরে বেশিরভাগ বাবু পরিবারের মেয়েদের বাইরে দেখাই যায় না। ব্রাহ্মণদের মেয়েরা অবশ্যি আলাদা। তুলনায় রাজবংশী মেয়েদের দেখ! দিব্যি ঘুরে ঘুরে কাজ করে। বাড়িতে অতিথি এলে অন্দরে লুকোয় না। অবশ্যি এটাই তাঁদের সমাজের নিয়ম। হিদারুর বাপ তাই মেজাজে থাকলেই নিজের ভাষায় যেটা বলে তার মর্মার্থ হল—‘সাহেব বেম্ম দেশি, মেয়েরা ওড়ে বেশি।’ মেয়েদের এই ওড়াউড়ি নিয়ে অবশ্য গর্বই অনুভব করে হিদারুর পরিবার। কোচবিহার আর বৈকুণ্ঠপুরে এটাই দস্তুর।

অথচ পঞ্চানন ঠাকুর দেশি লোকজনকে ক্ষত্রিয় হতে বললেন। ভাটিয়াদের বামুন দিয়ে পুজো করানোর নির্দেশ দিলেন—এই গোলমেলে ব্যাপারটা না হয় মানাই গেল। কালীপুজোয় জোর দেওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য খারাপ বলেননি। মনসা আর চণ্ডীর মধ্যে সম্পর্ক আছে, সেটা কে জানে। কিন্তু দেশি মেয়েদের বাইরে বেরুতে মানা করলেন, ঘরের মধ্যে ঘোমটা টেনে থাকতে বললেন—এটা কেমন কথা! অনেকেই নাকি এটা মেনে নিয়েছে। তা যে মানে মানুক। হিদারুর বাপ-দাদা মানতে রাজি নয়। হিদারুও নয়।

ফলে এখনও ক্ষত্রিয় হওয়া হয়নি তাঁদের। তাঁদের মতো আরও অনেকেরই হয়নি। এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি দূর করতেই এসেছে সাগাইরা। সুভাষ বসুর মিটিং দেখার পাশাপাশি এই কাজেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। তাই প্রায় শ'খানেক দেশি মানুষের সামনে পঞ্চানন ঠাকুরের ক্ষত্রিয় সমাজ-এর উদ্দেশ্য আর নীতি নিয়ে সে বলা শুরু করেছে চমৎকার ভঙ্গিতে। মেয়েদের ঘোমটা পরার ব্যাপারটার দিকে না গিয়ে সে বলতে শুরু করেছে রাজবংশী মানুষদের কোণঠাসা হয়ে পড়ার কাহিনি। কীভাবে ভাটি দেশের মানুষদের কাছে তাঁরা অপমানিত হচ্ছে, সেই কাহিনি। বোঝাই যাচ্ছে যে পঞ্চানন ঠাকুরের একজন উপযুক্ত শিষ্য। অনেক খবর জানে। একটু অনিচ্ছা নিয়ে শুনতে শুরু করেও হিদারু এক সময় তন্ময় হয়ে গেল তাঁর বক্তব্যে।

কথাগুলো অবশ্য ভেবে দেখার মতোই। শহরে হিদারুর কংগ্রেসি বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া বাকিদের মনোভাব হিদারুর অজানা নয়। বাগানের আপিস, সরকারের আপিস, মাস্টারমশাই, উকিল—এদের মনের কথাও পড়ে ফেলেছে হিদারু। শহরে তাঁর মতো রাজবংশী পরিবার বেশি নেই। কিন্তু প্রতিদিন নানা কাজের ধান্ধায় অনেকেই তো আসে শহরে। তাঁদের প্রতি শহুরে মানুষের তুচ্ছ-তাচ্ছিলের ভাবটা তাই প্রতিদিনই নজরে আসে তাঁর। নিজেও সেই তাচ্ছিল্যের মুখোমুখি হতে হয়। বাপ-দাদাদেরও। হিদারু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখা কবিতা জানে জেনে জনৈক বাগানের বাবু বলেছিলেন, ‘স্ট্রেঞ্জ!’ সেই উচ্চারণে একটা গা জ্বালানো হাসিও মিশে ছিল। সাগাই লোকটি সেই জ্বলনের দিকটাই উস্কে দিচ্ছিল তখন। কোচবিহারের রাজা যতদিন স্বাধীন ছিল, রায়কতরা যতদিন স্বাধীন ছিল ততদিন খাজনা আদায় করত কারা? সবাই রাজবংশী। কাছারিতে কাজ করত কারা? রাজবংশীরা।

হিদারু লক্ষ করল বিরাট উঠোনের পাশে একটি পেট্রোম্যাক্স অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে চারদিকে আলোআঁধারি মেশা ভূতুড়ে আবহাওয়ায়, তিস্তা থেকে ভেসে আসা হালকা হাওয়া মাখতে মাখতে একশো দেশি মানুষ স্তব্ধ হয়ে শুনছে লোকটির কথা। একশো জনের মনের সাধারণ ক্ষতটি ধরে ফেলেছে সেই সাগাই। হিদারু নিজেও স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। তাঁর বাপ-দাদারাও। এমনকি বালক-বালিকারাও চুপ করে ছিল সবাই।

বক্তা এতে উৎসাহিত হয়। সে ব্যাখ্যা করতে থাকে যে কীভাবে কোচবিহারের আধা দখল ইংরেজরা নিয়ে নেওয়ার পর খাজনা আদায় থেকে সবরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজে রাজবংশীদের বদলে দক্ষিণবঙ্গ থেকে লোক এনে বসানো হয়েছে। ‘এরা দেশি মানুষের সমস্যা কী বুঝবে? এরাই তো খাজনা আদায়ের নামে অত্যাচার করতে শুরু করেছে। দেশি মানুষদের অপমান করতে শিখেছে। এখন যা কিছু ক্ষমতা বলো, সব ওই ভাটিয়াদের হাতে। সাহেব বলো, ম্যাজিস্টর বলো... ওদের কথাই শোনে।’

এই বলে সে একটু থামে। পান খায়। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে থাকে পঞ্চানন ঠাকুরকে অপমান করার গল্প। কোচবিহারে কাছারিতে ঠাকুর একদিন নিজের মাথায় পরার ডোগাটার বদলে ভুল করে মৈত্র উকিলের ডোগা পরে বাড়িতে চলে এসেছিলেন। বুঝতে পেরে পরের দিন ফেরত দিতে যান সে ডোগা। তখন মৈত্র উকিল বলেছিলেন যে, সে ডোগা তিনি আর পরবেন না। কারণ সেটা একজন রাজবংশী মাথায় দিয়েছে। অপবিত্র হয়ে গেছে ডোগা। অন্ধকারের ভাগ বেশি থাকা আলোয় হিদারু দেখল শ্রোতাদের মুখে ফুটে উঠেছে কাঠিন্য।

১০

দু-পাশে উঁচু জমিতে চায়ের বাগান আর মাঝের নিচু রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলেন যাদব দাস। বাগানের গানি ব্যাগ, কন্টেনার প্রভৃতি বাতিল হওয়া জিনিস কিনে বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার ব্যবসা শুরু করেছিলেন বছর কয়েক হল। টুকটাক চলছে। রাস্তাটা বাগান থেকে বেরিয়ে একপাশে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। উলটো দিকে কুলি লাইন। সেটা অবশ্য বেশ উঁচু জমি। যাদব যাচ্ছিলেন সেদিকেই। বুধুয়া বলে একজন একটা দশ গ্যালনের কন্টেনার ধার নিয়েছিল। সেদিন ফেরত চাওয়ায় বলেছিল কিনে নেবে। কিনে নেবে বলতে পয়সা দেবে না। বলেছে কয়লা দেব খানিকটা। তারই সন্ধানে চলেছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে যাদব দাসকে খারাপ বলা যায় না। লেবারদের দু-চার পয়সা থেকে শুরু করে এক-দু'টাকা অবধি ধার দিয়ে থাকেন। সুদের জন্য তেমন কড়া হতে দেখা যায়নি

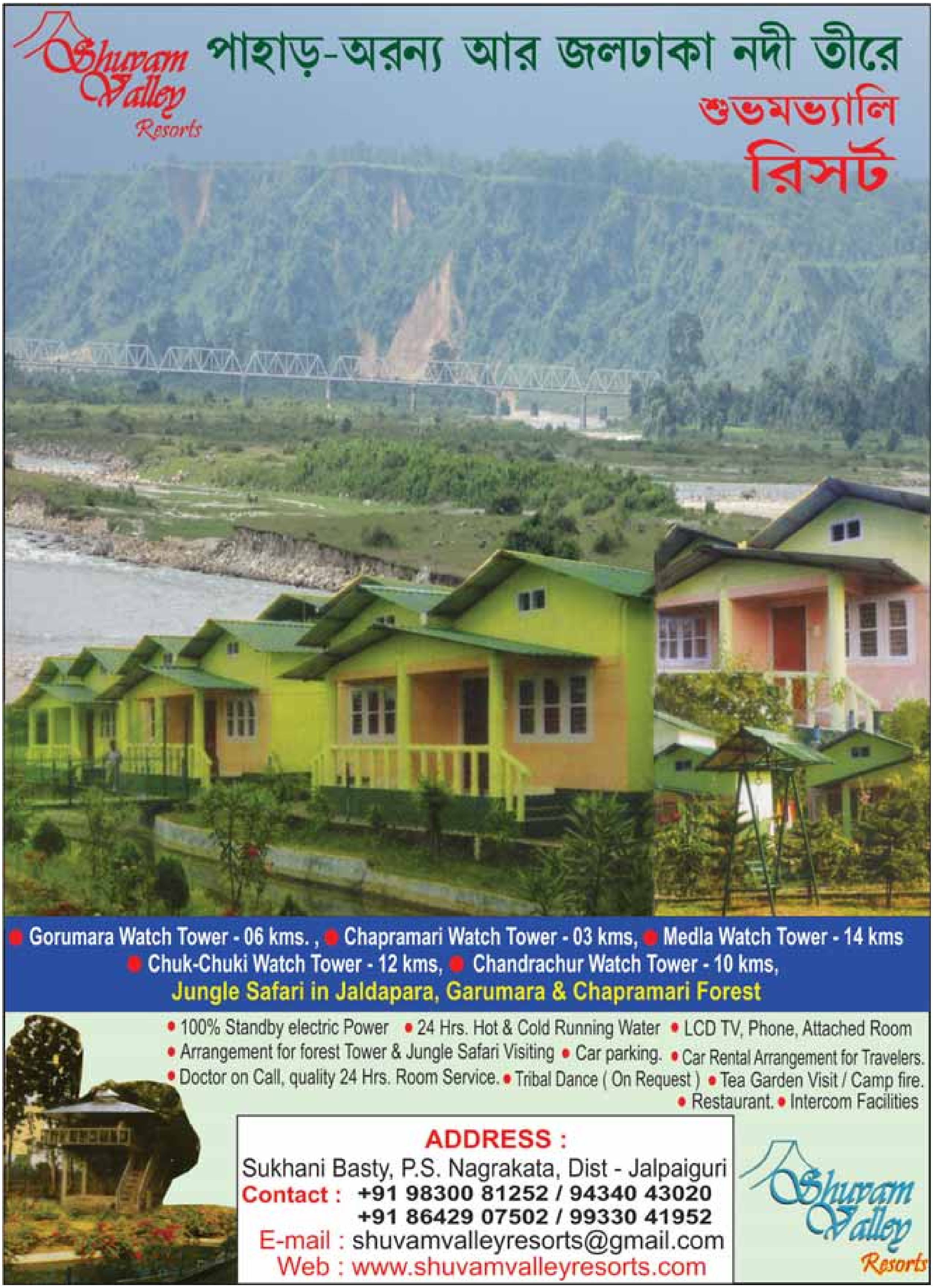
Shuvam Valley Resorts
পাহাড়-অরন্য আর জলঢাকা নদী তীরে
শুভমভ্যালি
রিসর্ট
Gorumara Watch Tower - 06 kms. , Chapramari Watch Tower - 03 kms, Medla Watch Tower - 14 kms
Chuk-Chuki Watch Tower - 12 kms, Chandrachur Watch Tower - 10 kms,
Jungle Safari in Jaldapara, Garumara & Chapramari Forest
• 100% Standby electric Power • 24 Hrs. Hot & Cold Running Water • LCD TV, Phone, Attached Room
• Arrangement for forest Tower & Jungle Safari Visiting • Car parking. • Car Rental Arrangement for Travelers.
• Doctor on Call, quality 24 Hrs. Room Service. • Tribal Dance (On Request) • Tea Garden Visit / Camp fire.
• Restaurant. • Intercom Facilities
ADDRESS :
Sukhani Basty, P.S. Nagrakata, Dist - Jalpaiguri
Contact : +91 98300 81252 / 94340 43020
+91 86429 07502 / 99330 41952
E-mail : shuvamvalleyresorts@gmail.com
Web : www.shuvamvalleyresorts.com
Shuvam Valley Resorts

কখনও। অবশ্য কুলি লাইনে সুদ কম-বেশি সবাই দিয়ে দেয়। কমতিটা উসুল করে দেয় শিকারের মাংস পাঠিয়ে। সব মিলিয়ে একটু হলেও ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে দু'পক্ষে। যাদব লেবারদের অবস্থানটা বোঝেন। 'কুলি লাইন' কথাটা সাহেবি হলেও সে লাইনে সাহেবিয়ানা প্রায় স্বর্গের ব্যাপার। যদিও বাগানটা বাঙালির, কিন্তু সে সাহেবের বাগান বলো আর দেশিরই বলো—কুলি লাইন কম-বেশি একই রকম।

বাগানে এই সময়টা চাপ একটু কম। দূরে ফ্যাক্টরি দেখা যাচ্ছে। বাগানে ছায়া দেওয়া গাছগুলি চা-গাছের সবুজের সঙ্গে মিলেমিশে আকাশের নিচে যে শ্যামলিমা তৈরি করেছে, তার ক্যানভাসে ফ্যাক্টরির উঁচু বাড়িটা চকচক করছে। সামনের ফাঁকা অংশটায় রঙিন পাড়ের সাদা শাড়ি পরা মেয়েরা বেতের ঝুড়ি ভর্তি চা নামিয়ে দিচ্ছে ওজনের জন্য। পেল্লায় দাড়ি পাল্লার সামনে পাগড়ি পরা ওজনকর্মী আর পাশে একটি টেবিলে খাতা রেখে কলম হাতে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বাবু। কয়েকটি মেয়ে ফিরে আসছিল লাইনের দিকে। কালো চকচকে শরীরে সাদা কাপড় আর চকচকে সাদা হাসি দেখতে বেশ লাগে যাদব দাসের। বাগানের এই কুলি-লেবারদের মতো সরল মানুষ আগে দেখেননি তিনি। বাগানে কাল সাপ্তাহিক মজুরির দিন। স্তূপ করা খুচরো পয়সা আর টাকা নিয়ে ম্যানেজারবাবু নিজে বসবেন। মজুরির নব্বই ভাগই উড়ে যাবে হাটে। পাঁচগুণ বেশি দাম দিয়ে কিনে আনবে ফিতে-চুড়ি-স্নো-পাউডার। যা কিছু চকচকে, রঙিন, ঝলমলে—তাইই কিনে ফেলতে পারলে বেজায় খুশি হয় মানুষগুলো। শুকনো লঙ্কা ঠাসা লাল টুকটুকে হাঁসের ডিম ঝাল, আলুর দম শিশুর মতো খেয়ে হাসবে মরদগুলো। বাচ্চাগুলো ঝাল সামলাতে জিভ বের করে রাখবে অনেকক্ষণ। অবাক চোখে দেখবে হাওয়া মিঠাই-এর ফুলে ওঠা কিংবা বায়োস্কোপের ফুটোয় রানি ভিক্টোরিয়ার ছবি। ম্যানেজারের দেওয়া খুচরো পয়সা ভাগাভাগি হয়ে যাবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। যাদব দাস দেখবেন। বাগানের স্টোর সামলানো বাবু একবার বলেছিলেন, 'বুঝলে যাদব! এরা এখনও পয়সাকে খোলামকুচি মনে করে।' কথাটা মিথ্যে নয়। হাটের দিনে ওদের পয়সা খরচ করার আনন্দ দেখলে মনে হবে বড়ো সুখে আছে।

অথচ যে কেউই মরে যায় যখন তখন। ম্যালেরিয়া, পেটের রোগ। ডেঙ্গু, কালাজ্বর—মেরে ফেলার মতো আয়োজনের তো অভাব নেই। কুলি লাইনে কোয়ার্টার বলতে তো ওই তেরো বাই বিশ ফুটের একটা ঘর আর সামনে বারান্দা। লোহার কাঠামোর উপরে অ্যাজবেস্টাস আর দেয়ালে বাঁশ-খড়। এর বদলে নিচু খড়ে ছাওয়া বাড়ি পেলে হয় তো স্বস্তিতে থাকত লোকগুলো। কিন্তু বাগান চলে নিয়মে। হাঁটা, চলা, বাড়ি, কোয়ার্টার, মাঠ, বাগান—সব চলে নিয়মে। তাই চওড়া মেটে রাস্তার দু'পাশে একটু ব্যবধানে পরপর দু'শো চল্লিশ বর্গফুটের আবাস নিয়ে গড়ে ওঠা কুলি লাইন সব বাগানেই এক রকম প্রায়। এখানে জলের জন্য একটা পাকা কুয়ো আছে যা অনেক বাগানের লাইনেই নেই। যাদব দাস জানে যে কেবল জল নয়, আরও অনেক কিছু নেই। এরপরেও যে হাসি আছে, জীবনকে মেনে নেওয়া আছে তার কারণ বোধহয় ওই পয়সা উড়িয়ে দিতে পারাটা।

তাই যাদবের একটু খারাপ লাগে। দশ গ্যালনের টিনের কন্টেনারের বিনিময়ে কয়লার পরিমাণ নিয়ে খাতকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে লক্ষ করে লাইনে একটু উত্তেজনা। যাদব জিজ্ঞাসু হতেই বুধুয়া মহা উত্তেজনায় জানিয়ে দেয়, এবারের হাটের মুখ্য আকর্ষণের কথা। 'টৌন' থেকে আজকের লোক এসে পৌঁছেছে বাগানে। তাঁবু ফেলেছে হাটের পশ্চিমে। কাল তাঁবুর ভেতরে পর্দায় ছবি ফেলবে তাঁরা। সে ছবি নাচবে-চলবে-দৌড়বে। 'টিরেন যাইবে, মে নচিবে, আউর উয়ো এইসন বড়া বড়া নাও আছে— কী জানো বলে— জহাজ। জহাজ ভি যাইবে পানিমে... ! তবে হাঁ। টিকেট লগবে অঠানা।'

খবরটা ভাসা ভাসা শুনেছিল যাদব। হাটে রংদার বিলিতি কাপড় নিয়ে আসে সেই রামগোপাল। বলেছিল, তাঁর এক দেশোয়ালি ভাই আসছে কলকাতা থেকে ছবি দেখানোর মেশিন, বিজলির যন্ত্র আর ফিলিম নিয়ে। এ জিনিস এদিকে আগে আসেনি। যাদব দাস বুঝতে পারেন কুলি লাইনের উত্তেজনার গভীরতা। এটাও বুঝতে পারেন যে আগামীকাল সুদের পয়সা একটু উঠবে। তিনি উঠে দাঁড়ান। বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে। তিনি হাটের দিকে হাঁটা দিলেন। কালকের দিন পর্যন্ত হাটের লাগোয়া বিনোদ শা'র বাড়িতেই থাকছেন তিনি। পরশু কাকভোরে বেরিয়ে পড়বেন নাগ্রাকাটা স্টেশানের দিকে। সেখান থেকে দোমোহানি। পকেটে বাগানের মাল কেনার কাগজ। জলপাইগুড়িতে সে কাগজ বেচে টাকা পাবেন।

হাট দূরে নয়। যাদব দাস কুলি লাইন থেকে বেরিয়ে ঢালু পথে নামতেই হাতি আসছে একটা। পিঠে মাহুত ছাড়াও ছোট ম্যানেজার। বস্তুত, এই নামের কোনও ম্যানেজারের পোস্ট নেই বাগানে। হাতির আরোহী ব্যক্তিটি মুসলিম হওয়ার কারণে তাঁকে কেউ কেউ বলে 'ছোটে মিঞা'। বাগানের কাজ শিখছে। মালিকপক্ষের বেশ কাছের লোক এই 'ছোট ম্যানেজার'। যাদব দাস শুনেছেন উনি কিছুদিন আগেও হিন্দু ছিলেন। একজন মুসলিম তাঁকে দত্তক নিয়েছেন। টাউনের খান বাহাদুর পরিবারের সঙ্গে নাকি ভাল খাতির এঁর। তবে লোকটি ভাল। কাজ শেখা ছাড়া আর কিছুতে মন নেই। যাদব দাসের ধারণা ভবিষ্যতে বাগানের ম্যানেজারি এঁর হাতেই যাবে। সেই ধারণা থেকেই সে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে যায়। একটু ঝুঁকে ছোট ম্যানেজারের উদ্দেশে বলেন, 'গুড ইভিনিং সার।'

বাগানের হাতি যাদব দাসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ছোট ম্যানেজার মাথা থেকে শোলার হ্যাটটা খুলে চুলে একবার হাত বুলিয়ে রাজবংশী মাহুতকে কিছু বলতেই সে হাতিটাকে বসার নির্দেশ দেয়।

'কুলি লাইন থেকে আসছেন দেখলাম?' ছোট ম্যানেজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। 'আপনার সঙ্গে তো ওদের গুড রিলেশন, তাই না?'

যাদব দাস বিভ্রান্ত হয়। বাগানে মেলামেশার ব্যাপারে অনেক নিয়মকানুন আছে। কিন্তু সে সব কর্মচারীদের জন্য। যাদব দাস তো তেমন নন। এটা মনে হতে সে একটু আত্মবিশ্বাস পেয়ে সহজ হয়। 'কাল হাটে মুভি দেখাবে সার। লাইন এখন এই নিয়েই বিজি।'

—সে তো ভাল কথা। বলে কয়েক পা হাঁটলেন ছোট ম্যানেজার। রাস্তার উঁচু ঢালে উঠে যেন ভাল করে দেখার চেষ্টা করলেন কুলি লাইনটা। মিনিট পাঁচেক পর্যবেক্ষণের পর আবার ফিরে এলেন হাতিটার কাছে।

—একটু খোঁজ নেবেন তো কেউ সাহেবদের বিরুদ্ধে লোক খ্যাপাচ্ছে কি না!

কথাটা বলেই ছোট ম্যানেজার হাতির পিঠে উঠে পড়লেন। হাতি হেলতে দুলতে চলে গেল বাগানের দিকে। যাদব দাসের অবশ্য বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে ছোট ম্যানেজার কী বলতে চেয়েছিলেন। বাগানের বাতিল জিনিস কিনতে তাঁকে ঘুরতে হয় নানা চা-বাগিচায়। শহরের হেড আপিসের বাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। বাগানের কুলি-লেবারদের মধ্যে সাহেব বিরোধী হাবভাবের ইঙ্গিত যে কোনও কোনও বাগানে ফুটে উঠেছে সে খবর কানে এসেছে যাদব দাসের। কিন্তু এখানে সে সব নজরে পড়েনি। তবে এটা তো সাহেবদের বাগান নয় এবং থানাটাও বেশ দূরে। যাদব দাসের হঠাৎ মনে হল যে এই রকম পরিবেশই বিপ্লবীদের পছন্দ। মনে হতেই শরীরটা একটু ছম ছম করে উঠল তাঁর। বিকেল শেষের আলোয় ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাটের দিকে চলে যাওয়া পথটাকে তাঁর বেশিক্ষণ নিরাপদ বলে মনে হল না। তিনি জোরে হাঁটা দিলেন। হয়ত কোনও বিপ্লবী লুকিয়ে ছিল না সেই পথে, তবুও তাঁর দ্রুত হাঁটার প্রয়োজন ছিল। কারণ কুলি-মজুর-সাহেব-বাবু-যাদব—বাঘের কাছে এই বিভাজনের কোনও মূল্য নেই।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

অঙ্কন : সুবল সরকার

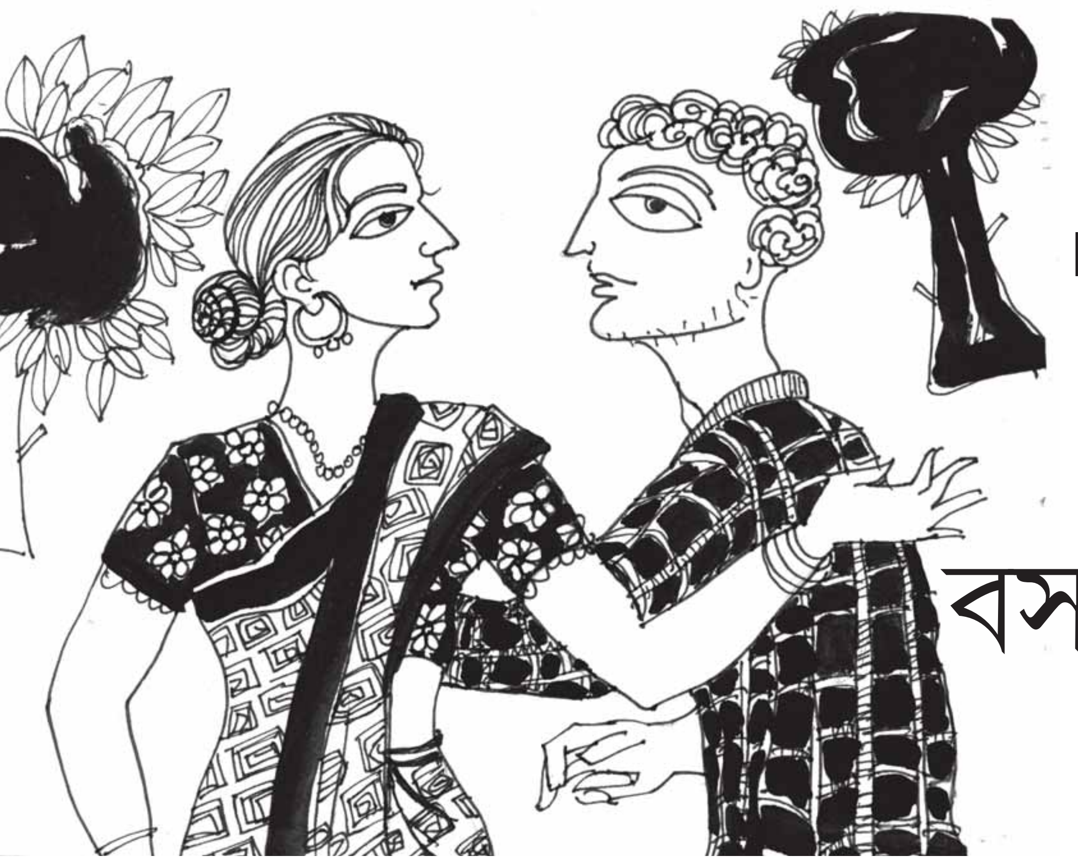

ধারাবাহিক উপন্যাস

বসন্তপথ

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

(আগে যা ঘটেছে তিথি এই প্রজন্মের মেয়ে হয়েও তার বন্ধুদের মতো কেবলমাত্র কেরিয়ার গড়ার উচ্চাকাঙ্খায় বিভোর নয়। তিথি সুমনকে ভালবাসে। তাই নিজের পরিচিত অভ্যস্ত নিরাপদ পরিবেশ, সমস্ত জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আর্তি অবহেলায় তুচ্ছ করে তিথি এগিয়ে এসে হাত ধরে তার ভালবাসার মানুষটির। ডুয়ার্সের এক প্রত্যন্ত গ্রাম পাতাঝোরায় শুরু হয় তাদের যৌথজীবন। এদিকে উৎপলেন্দু-মিমি কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি নন সুমনকে। মেনে নিতে রাজি নন তিথির মামা দীপকও। দীপকের স্ত্রী তুলির মন তিথির জন্য কাঁদলেও তিনি পারিবারিক চাপে অসহায়। সুমনের স্কুলের হেডমাস্টার মধুসূদন পাতাঝোরাকে অন্তর থেকে ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গে ভাব হয়ে যায় তিথি-সুমনের। এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান ইয়াসিন সুমনকে তাদের রাজনৈতিক দলে যোগ দেবার প্রস্তাব দিলে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে সুমন। ভোর রাতে সাপের ভয়ানক স্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে তিথি। দিল্লি থেকে সপরিবারে আসা উৎপলেন্দুর দাদা বিমলেন্দু চান সুমন-তিথির কাছে গিয়ে সব মিটমাট করে নিতে। রাজি হন না উৎপলেন্দু। তিথির বন্ধুরা প্ল্যান করে হঠাৎ করে পাতাঝোরা গিয়ে তিথিকে চমকে দেবার। তারপর...)

২২

'Your children are not your children...
You may give them your love
But not your thoughts,
For they have their own thoughts.
You may house their bodies
But not their souls,
For their souls dwell in the
House of tomorrow, which you
cannot visit,
Not even in your dreams.'
Kahlil Gibran, 'The Prophet'

এতদিন পক্ষীশাবকের মতো ছেলেকে আগলে রেখেছেন তুলি আর দীপক। এবার একটু একটু করে বড় হচ্ছে ঋভু। স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি, বেশ ভাল রেজাল্ট করে আসছে বরাবর। এবার বোধ হয় সময় এসেছে। ছবির মতো সুন্দর প্রথম বিশ্ব এসে ঋভুর দরজায় কড়া নাড়বে কিছুদিন পর। তখন তার মোহময় আকর্ষণ কি ছাড়তে পারবে ঋভু? মনে হয় না। একদিন ঋভুও উড়ে যাবে সাগরপাড়ে। দূর থেকে কৃতী ছেলেকে দেখবেন তুলি আর দীপক।

খলিল জিব্রানের লেখাটা পড়ে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মন কেমন করা অনুভূতি প্রগাঢ় ছায়া ফেলছিল মনে। একমাত্র সন্তান ঋভুর জন্য ভাবনা হচ্ছিল। সন্তানের কোন বয়সে কতটা স্বাধীনতা প্রাপ্য, সেটা বোঝা প্রায় অসম্ভব কাজগুলোর মধ্যে একটা। ঠিক কতখানি দায়িত্ব দিতে হবে তার কাঁধে, ঠিক কতটা হস্তক্ষেপ তার প্রয়োজন সেটা আঁচ করাও মুশকিল।

শুধু তাই নয়, কতটুকু তাকে দেখতে থাকা দূর থেকে, ঠিক কোথায় বাবা-মায়ের গণ্ডী শেষ হয় আর ডানা মেলে আগামীর মুক্ত আকাশে উড়ান দেবার জন্য ছেড়ে দিতে হয় তাকে, এর কোনওটারই কোনও সঠিক হিসেব কিছু নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আমাদের প্রত্যেকটি সন্তানই তাদের নিজস্ব দোষ আর গুণ নিয়ে নিজের মতো করে সুন্দর। তাই সুন্দরভাবেই বাঁচুক আমাদের সন্তান। নিজের মতো করে।

এমনটাই তো হয়। এটাই ভবিতব্য। বন্ধুদের ছেলেমেয়েদের তো দেখে আসছেন তুলি। এই তো নন্দিতার মেধাবী মেয়ে শিফট করে গেল মালয়েশিয়াতে। ওখানেই বিয়ে করে নিয়েছে এক সহকর্মীকে। কাবেরীর বিজ্ঞানী ছেলে বিদেশের পাট চুকিয়ে দেশে ফিরেছিল গত বছর। গুজরাতে কিছুদিন থেকে তার পছন্দ হয়নি, আবার ফিরে গিয়েছে আমেরিকার

ডালাসে। অমলার মেয়ে পাড়ি দিয়েছে নিউ ইয়র্কে। ফোন করে ক্বচিৎ-কদাচিৎ, আসলে মা-বাবার সঙ্গে তাদের যোগাযোগের মাধ্যম এখন স্কাইপ বা হোয়াটস অ্যাপ।

আজকাল সকলেই কেরিয়ার সর্বস্ব। তবুও এই ছেলেমেয়েদের ভিড়ে কেউ কেউ আবার একেবারেই আলাদা। তিথি যেমন। পড়াশোনায় ভাল ছিল বরাবর, তবুও কেন যে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এমন একটা জীবন বেছে নিল কে জানে। এমন হঠকারী একটা সিদ্ধান্ত তিথি কেন নিল তার রহস্য জানা নেই তুলির।

উৎপলেন্দু-মিমির একমাত্র সন্তানটির উপর তাঁর বরাবর দুর্বলতা। তিথিকে প্রাণ থেকে ভালবাসেন তুলি। সেই ছোট থেকে নিজের মেয়ের মতো করেই দেখে এসেছেন তিথিকে। এখনও গভীর রাতে তিথিকে স্বপ্নে দেখেন, তার দুর্দশার কথা ভেবে ভেবে কষ্ট পান তুলি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তিথিও তাঁকে ভালবাসে অন্তর থেকে।

এই তো কিছুদিন আগে দীপকের সঙ্গে রায়মাটাং-এ বেড়াতে গিয়েছিলেন তুলি। সেখানেই তাঁর মোবাইলে সাতসকালে ফোন এসেছিল তিথির। পাতাঝোরা বাজারের একটা এসটিডি বুথে এসে ফোন করেছিল। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছিল কিছু একটা। বেচারির মনটা খারাপ ছিল সেজন্য। কিন্তু কী সেই স্বপ্ন সেটা খুলে বলেনি তিথি।

তিথির জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই উচাটন বোধ করেছিলেন তুলি। সেদিন রায়মাটাং থেকে ফিরে আসার সময় গাড়িতে পাশাপাশি বসে দীপকের কাছে একবার কথাটা সাহস করে পেড়েওছিলেন। পাতাঝোরায় গিয়ে তিথির সঙ্গে একবার দেখা করে এলে কেমন হয়!

উত্তরে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেননি দীপক। কিন্তু কপালে চারটে ভাঁজ ফেলে এমন করে তুলির দিকে তাকিয়েছিল যে তারপর স্বামীকে আর ঘাঁটাতে সাহস পাননি তুলি। কিন্তু পাতাঝোরায় সুমনদের বাড়িতে যে উৎপলেন্দু, মিমি কিংবা দীপকরা কেউই যাবেন না সেটা বিলক্ষণ জানা হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

গত দু'দিন তুমুল বৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়িতে। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব নদীতেই জল ফুঁসছে এখন। এদিকে তিস্তার জল বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে। ময়নাগুড়ির ওদিকে পদ্মাবতীর চরের বেশ খানিকটা ডুবে জলের নিচে। জলপাইগুড়ি শহর দু'ফাঁক করে চলে গিয়েছে যে নদী সেই করলাতেও বেড়েছে। বাবুঘাটের সিঁড়িগুলির সবচাইতে উঁচু ধাপ প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে নদীর জল। আর সামান্য জল বাড়লে শহরে ঢুকে পড়বে করলার জল।

রেনি ডে ঘোষণা করে দিলেন বড়দি, সাততাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল স্কুল। সকালে দিদি মলির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল অনেকক্ষণ। মোবাইলে ব্যালান্স প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছে। রুবি বোর্ডিং-এ উলটোদিকে টিঙ্কুর মোবাইলের দোকান থেকে মোবাইলের ব্যালান্স ভরেন তুলি। আজ স্কুল থেকে বেরিয়ে রিকশা নিয়ে সেখানে একবার গেলেন স্কুল থেকে ফেরার পথে।

টিঙ্কুর দোকানের বাইরে দেখা হয়ে গেল তিথির বন্ধু আকাশ আর নীলের সঙ্গে। বারমুডা আর সাদা টি শার্ট পরা আকাশ ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল। তুলিকে দেখে সিগারেট তড়িঘড়ি ফেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। নীলও এগিয়ে এসেছে। স্মিতমুখে দু'জনেই একসঙ্গে বলল, 'কেমন আছ?'

তুলি বললেন, 'ভাল। তোরা কেমন আছিস? পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? তোরা তো খুব ঘুরিস শুনি। এর মধ্যে কোথাও যাস-টাসনি?'

আকাশ বলল, 'এই তো দু'দিনের জন্য আমরা কোলাখাম ঘুরে এলাম। শনিবার গিয়ে রাতটুকু থেকে রবিবার ব্যাক করেছি।'

তুলি চোখ গোল গোল করে বললেন, 'এই বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ে? তোরা সত্যিই পাগল আছিস। কোলাখামে আমার কখনও যাওয়া হয়নি। জায়গাটা লাভা-রিশপের আশপাশ দিয়ে তাই না?'

নীল বলল, 'লাভা থেকে নর্থ ইস্টের দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেলে আর একটা ছোট পাহাড় শুরু হয়। সেই পাহাড়ের মাথাতেই একটা গ্রাম হল কোলাখাম। লাভা থেকে আট কিলোমিটার দূর। কিন্তু পাহাড়ি রাস্তা তো, তাই আধঘণ্টার একটু বেশিই লাগে যেতে। কোলাখামের ঠিক উলটোদিকের পাহাড়ের উপর হল রিশপ।'

আকাশ হেসে বলল, 'পাথরের বোল্ডার দিয়ে তৈরি রাস্তা। ফলে এই আট কিলোমিটার পথের পুরোটাই গাড়ি কত্থক আর ভরতনাট্যম নাচতে থাকে। তবে ঝক্কি পুষিয়ে যাবে একবার কোলাখামে পৌঁছতে পারলে। এমন শান্ত পরিবেশ তুমি কোথাও পাবে না।'

তুলি বললেন, 'ওই গ্রামে হোটেল আছে?'

নীল বলল, 'কোলাখাম গ্রামে ছিয়াত্তরটা ফ্যামিলি থাকে। তাদের হেড যে তাকে ওরা বলে পাপাজি। সেই পাপাজির একটা হোম স্টে আছে। সেখানেই ছিলাম। ওখানে হোম স্টে আছে আরও কয়েকটা। ওখানে রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার আর অতিথি আপ্যায়ণের ব্যাপারটা পুরোটাই দেখে গ্রামের লোকেরা।'

তুলি একটু হেসে বললেন, 'তোদের কথা শুনে লোভ হচ্ছে। দেখি কর্তাকে বলব একবার কোলাখামে ঘুরতে যাবার প্ল্যান করার জন্য।'

আকাশ বলল, 'যাও ঘুরে এসো, খুব এনজয় করবে। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন তো ওয়েদার খারাপ ছিল। সারা রাত বৃষ্টি। আমাদের প্রত্যেকের তো মন খারাপ। ফরচুনেটলি সকালে বৃষ্টি ধরে এল। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্পষ্ট হল একটু একটু করে। মনে হচ্ছিল যে হাতে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ দেখছি। তারপর ম্যাজিকের মতো এক-একটা পর্দা উঠে যেতে লাগল, পরিষ্কার হতে লাগল সামনের পাহাড়গুলো।

নীল হাসল, 'তবে যাঁদের কাছে বেড়ানোর অন্য নাম হল শপিং তাঁদের কোলাখাম জায়গাটা পছন্দ হবে না। কেননা একটাও দোকান নেই ওখানে। কাজেই কেনাকাটা করার স্কোপও নেই। রোজ আধঘণ্টা পাহাড়ি চরাই উৎরাই পথে ট্রেকিং করে লাভা থেকে খাবারদাবার কিনে আনে ওখানকার লোকেরা।'

আকাশ বলল, 'কোলাখাম থেকে আনার মধ্যে আমরা দু'জনে দু'টো করে এলাচ গাছের চারা নিয়ে এসেছি মেমেন্টো হিসেবে। খুব যত্ন করে বাড়ির বারান্দায় দু'টো টবে চারাদু'টো পুঁতেছি। জানি না সেগুলো কোনওদিন বড় হবে কিনা।'

তুলি একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তিথির দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। গলা খাকারি দিয়ে বললেন, 'তোরা তো বন্ধুরা মিলে এত ঘুরিস। পাতাঝোরায় একবার যেতে ইচ্ছে করে না তোদের?'

নীল আর আকাশ নিজেদের মধ্যে তাকাল একবার। আকাশ বলল, 'ইটস আ সিক্রেট। শুধু তোমাকেই বলছি। কাউকে বোলো না যেন। তিথিকে তো নয়ই।'

তুলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী গোপন কথা রে?'

আকাশ বলল, 'আমরা বন্ধুরা মিলে প্ল্যান করেছি সামনের সপ্তাহে সদলবলে যাব পাতাঝোরায়। তিথি এর মধ্যে একদিন এসটিডি বুথ থেকে ফোন করেছিল আমার মোবাইলে। এটা ওটা কথা হয়েছে। কিন্তু আমরা যে পাতাঝোরায় যাচ্ছি সেটা পুরো চেপে গিয়েছি। বিন্দু-বিসর্গ বলিনি ওকে, জবরদস্ত একটা সারপ্রাইজ দেব বলে।'

নিজের ছেলের কথা মনে পড়ল তুলির। ঋভু এর মধ্যে দু'দিনের জন্য এসেছিল জলপাইগুড়িতে। দীপক যখন বাড়ির বাইরে তখন ছেলের কাছে কথাটা পেশ করেছিলেন তুলি। ঋভু তখন খেতে বসেছিল। ভাতের গ্রাস মুখে দিতে গিয়েও নামিয়ে এনেছিল থালায়। মাথা নেড়ে বাচ্চাদের বোঝাবার ঢঙে বলেছিল, 'মা ডোন্ট বি সিলি। ডোন্ট বিহেভ লাইক আ কিড। বাবা শুনলে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে সেটা তুমি ভাল করে জানো।'

আহত মুখে ছেলেকে দেখছিলেন তুলি। তিথি ঋভুর থেকে বয়সে সামান্য বড়। ঋভু অঙ্কে কাঁচা ছিল ছোটবেলায়। সিক্স-সেভেনে থাকতে প্রায়ই যেত তিথির কাছে পড়া বুঝতে। ঋভুর অঙ্ক-ভীতি কাটিয়ে দিয়েছিল তিথি। আরও একটু বড় হবার পরও ঋভুর তিথি নির্ভরতা কাটেনি। স্কুলের উঁচু ক্লাসেও শক্ত পড়া বুঝতে হরদম গিয়েছে তিথির কাছে। দু'জনে খুনসুটিও করত বিস্তর। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে লেগে থাকত নিরীহ কোঁদল। ভাব-ভালবাসাও ছিল দিব্যি। বাড়িতে না বলে দুই ভাইবোনে অনেক দিন বাইরে বিরিয়ানি খেয়ে এসেছে, সিনেমা দেখেছে একসঙ্গে।

সেই ঋভু এখন হঠাৎ করে ভুলে গিয়েছে পুরনো সব কথা। গো-বলয়ে অনার কিলিংয়ের ঘটনা ঘটে আকছার। নিচু জাতের ছেলের সঙ্গে বাড়ির মেয়ে সম্পর্ক তৈরি করতে চাইলে সেই মেয়েটির

মা-বাবা-ভাই নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করে। মেয়েটির মনটাকে বুঝবার চেষ্টা করে না কেউ।

ঋভু মা-র দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, 'তাছাড়া সবচাইতে বড় কথা পিসি আর পিসনও ভাল চোখে নেবেন না ব্যাপারটা। খামোখা বড়দিভাইয়ের জন্য আমাদের দুই ফ্যামিলির মধ্যে একটা বিটারনেস তৈরি হবে। তাছাড়া বড়দিভাই যাঁদের মেয়ে তাঁরাই যেখানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন সেখানে তুমি কেন এতটা ইমোশনালি অ্যাটাচড হচ্ছ শুনি?'

চুপ করে গিয়েছিল তুলি। আর কথা বাড়ায়নি। এখন আকাশের কথা শুনে মনটা আনন্দে ভরে গেল তুলির। চোখে বাষ্প এসে জমছিল, গলার কাছটা কেমন যেন করছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না তুলি। তিথির বন্ধুদের সঙ্গে তিনি নিজেও যদি একটিবার যেতে পারতেন পাতাঝোরায়, গিয়ে দেখে আসতে পারতেন তিথিকে!

তুলি ডুবে গিয়েছিলেন নিজের মধ্যে। নীল লক্ষ করছিল তুলিকে। বলল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে পাতাঝোরায় যাবে?'

তুলি সম্বিত ফিরে পেতে পেতে বললেন, 'আমি?'

নীল বলল, 'পাতাঝোরা গ্রামে থাকার মতো কোনও হোটেল-টোটেল আছে বলে মনে হয় না। ওদিকে এতগুলো মানুষ তিথির শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠলে ওদের বিস্তর অসুবিধা হবে। আমরা তাই ঠিক করেছি একটা গাড়ি ভাড়া করে নেব। একদম ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাতাঝোরায় যাব। রাতের মধ্যে ফিরে আসব। তুমি কিন্তু ইচ্ছে করলে যেতে পারো আমাদের সঙ্গে।'

তুলি একটা শ্বাস গোপন করে বললেন, 'আমার যাওয়া হবে না। তোরা ঘুরে আয়।'

২৩

আসনের থেকে বড় অথচ শতরঞ্চির বা কার্পেটের চাইতে ছোট। যোগমায়া চশমা চোখে দিয়ে যে জিনিসটা নিয়ে এখন সেলাইয়ের কাজ করতে বসেছেন তার নাম সুজনি। শাশুড়ির কাছে গুটিশুটি বসে মনোযোগী ছাত্রীর মতো থুতনিতে হাতের তালু দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কাজটা দেখছে তিথি।

তলায় একটা মোটা কাপড় দিয়ে লাইনিং দেওয়া। উপরে দৃশ্যসুষমা আনার জন্য চটের উপর সেলাই দিয়ে করা হয়েছে আঁকিবুঁকি। পুরনো সোয়েটার থেকে খুলে নেওয়া বিভিন্ন রঙের উলের ক্রস-স্টিচ বা হেরিংবোন স্টিচের ফোঁড় দেওয়া। মাঝে মাঝে একটা করে অ্যাপ্লিক। অ্যাপ্লিকের ফুল বা পাতাগুলো তৈরি হচ্ছে পুরনো সোয়েটার থেকে। শিক্ষানবিশের মতো হাঁ করে যোগমায়ার হাতের কাজ দেখছিল তিথি। কৌতূহলী স্বরে বলল, এটা কার সোয়েটার?

যোগমায়া চশমাটা নাকের ডগায় নিয়ে হেসে বললেন, 'তুমি ভাবছ এটা সুমনের সোয়েটার? ভুল ভাবছ। এটা আমার ছেলেবেলার সোয়েটার।'

তিথি অবাক হল, 'তাই?'

যোগমায়া বললেন, 'আসলে আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা পরিবার। কিশোরগঞ্জে ছিল আমাদের আদি বাড়ি। দেশ ছেড়ে যখন এসেছিলাম বাবা-মায়ের হাত ধরে আমি তখন খুব ছোট তবুও অনেক কিছুই এখনও মনে আছে। এখানে এসে বাবা চাকরি জুটিয়েছিলেন একটা জুটমিলে। সামান্য মাইনে। এদিকে আমরা ছিলাম পাঁচ ভাইবোন। অভাবের সংসার।'

তিথি বলল, 'তার মানে অনেক হিসেব কষে তোমাদের চলতে হয়েছে তখন?'

যোগমায়া বললেন, 'সে তো বটেই। ব্যয়সঙ্কোচ ছাড়া উপায় ছিল না বাঁচার। শুধু আমরা তো নই তখন প্রত্যেক পরিবারেই ওই একটি ছবি। প্রথম সন্তানের গায়ে যে সোয়েটার উঠেছিল সেই সোয়েটার যখন আঁট হতে শুরু করল সেই সোয়েটার তখন দ্বিতীয় সন্তানের গায়ে উঠল। তারপর তার মালিকানা গেল তৃতীয় সন্তানের কাছে। ওদিকে মা প্রত্যেক শীতেই তখন উলকাঁটা বুনছেন। একটু বড় ঝুলের বড় মাপের সোয়েটার যাতে প্রায় যে কোনও সন্তান সেই ফ্রি সাইজের সোয়েটারে মাথা গলিয়ে দিতে পারে।'

তিথি বলল, 'কিন্তু একসময় বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে সেই সোয়েটার আর কারও গায়ে হবে না। তখন কী করা হত?'

যোগমায়া হাসলেন, 'ফেলার ব্যাপার নেই। এই সোয়েটারটা যেমন আমার উপরের চার দাদা আর দিদি পরেছে চুটিয়ে তারপর এর উত্তরাধিকার আমার কাছে এসেছে। একে ওকে দিয়ে-থুয়েও বেশ কিছু সোয়েটার ট্রাঙ্কে পড়েই থাকত। মা'কে দেখেছি সেই জমে যাওয়া সোয়েটার থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফুল, পাতা এসব তৈরি করতে। সেগুলো লাগানো হত চটের উপর। মা'কে দেখে দেখে আমিও শিখেছি। এই যে এখন যেমন সবুজ উলের চাকতিগুলোর থেকে কেটে কেটে গাছের পাতা বানাচ্ছি। লাল-হলদে-নীল উল দিয়ে বানাচ্ছি রং-বেরঙের ফুল।'

তিথি বলল, 'বৌদ্ধ ধর্মের বিহার বা মঠগুলোর একটা গল্প কোথাও পড়েছিলাম। সেটা মনে পড়ে গেল।'

যোগমায়া বললেন, 'কী গল্প?'

তিথি বলল, 'ভিক্ষায় পাওয়া নতুন কাপড় গেরুয়া বা লাল রঙে চুবিয়ে পড়তেন বৌদ্ধ সাধুরা। দিনের পর দিন ব্যবহার করতে করতে একেবারে ন্যাতার মতো হয়ে যেত সেগুলো। তারপর সেই কাপড় দিয়ে কাঁথা বাক্স নানো হত। সেই কাঁথা একসময় ব্যবহারযোগ্য থাকত না। তখন ঘর মোছার কাজে ব্যবহার হত সেগুলো। তারপর যখন পুরোপুরি সুতো হয়ে যেত তখন সব ছেঁড়া ন্যাতার কুচি মিলিয়ে দেওয়া হত ঘরের মাটির প্রলেপে। তার কারণ হল কাপড়, তার মূল উপাদান কার্পাসে চলে যাবার পরেও কার্যকরী থাকে। তাকে ব্যবহার করা যায় তখনও। তা মাটি লেপার সময় মিশে যাবে মাটির সঙ্গে। অর্থাৎ কিছু ফেলা যাবে না। এটাই হল ওদের দর্শন।

যোগমায়া বললেন, 'তাহলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমাদের স্বভাবের অনেকটা মিল আছে বলতে হবে। আমরা, বাঙালিরাও কিছু ফেলি না। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাঙালরা তো নয়ই।'

তিথি বলল, 'শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, গৃহিণীর পুঁটলি বইছিস কেন? কেননা দর্শন শেখায় ত্যাগ করতে। জমিয়ে রাখতে তো নয়। কিন্তু মেয়েরা বোধ হয় দর্শনের ঠিক উল্টো কাজটা করে। জমিয়ে রাখে সব। দরকারি তো বটেই যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিসও।'

যোগমায়া একটা শ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি হয়ত এটাকে কৃপণতা ভাবছ কিন্তু আমাদের মতো সেই ছিন্নমূল মানুষগুলোর কথা ভাব একবার। দেশভাগ, খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, দাঙ্গা, অসুখ, মৃত্যু এসব তাদের গায়ের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। হাতে একটা ছোট্ট পুঁটলি নিয়ে তারা চেষ্টা করেছে টিকে থাকতে। শাড়ি কেটে জানলার পর্দা করেছে। বিছানায় দিয়েছে পুরনো শাড়ির কাঁথা আর লেপের ওয়ার। পুজোর সময় পাঁচ ভাইবোনের একই ছিটের জামা। চূড়ান্ত অভাবের মধ্যেও হাসিমুখে সংসারের চাকা ঘুরিয়েছে প্রাণান্তকর চেষ্টায়।'

তিথি বলল, 'অল্প টাকায় বিশাল সংসার প্রতিপালন করতে গিয়ে ভাতের থালাতেও তো টান পড়ত নিশ্চয়?

যোগমায়া বললেন, 'মাছ মাংস তো আসত ক্বচিৎ-কদাচিৎ। এমনকি ডিম পর্যন্ত কম পড়ত পাতে। তখন সুতো দিয়ে কেটে ভাগবাঁটোয়ারা করা হত সেই ডিম। তিনটে ডিম হয়ত সেদিনের জন্য বরাদ্দ। এদিকে আমরা বাবা-মা সমেত পাঁচ ভাইবোন বসে আছি হাঁ মুখ করে। তখন সেই তিনটে ডিমের অমলেট বানিয়ে টুকরো টুকরো করে টম্যাটো পেঁয়াজ রসুনের লাল-লাল ঝোলে ফেলে দিত মা। দিব্যি খেতাম। আমরা কিন্তু সেই অভাবের দিনেও খুশিই ছিলাম। বিলাপ করিনি কখনও।'

তিথি বলল, 'তোমার হাতের ওই রান্নাটা আমার সবচাইতে প্রিয়। ওই যে ডিম ফেটিয়ে তার মধ্যে ময়দা বা ব্যসন আর পেঁয়াজকুচি দিয়ে গোল-গোল বড়া ভেজে ঝোলে দেওয়া রান্নাটা। তোমার আলুর খোসা বা পটলের খোসার ছেঁচকি কিংবা লাউয়ের খোসার ঝিরিঝিরি ভাজা, যার মধ্যে একটু আলু বা কুমড়ো পড়লে... আহা!'

যোগমায়া হাসলেন, 'এই সবই তো শিখেছি মা'র কাছ থেকে। কোনও কিছুই ফেলা যাবে না এই মানসিকতা থেকে। জল দিয়ে পান্তাভাত

খোলা একঢাল কালো চুল, পরনে লাল পাড় সাদা গরদের শাড়ি। উৎপলেন্দু পিছন পিছন দৌড়চ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছেন না তিথির। দূর থেকে উঁচু গলায় ডাকছেন মেয়েকে, ডেকেই চলেছেন। কিন্তু তার ডাক যেন শুনতেই পাচ্ছে না তিথি।

বানানো তো আছেই তাছাড়া একটু পুরনো মুসুল ডালকে জল মেরে মেরে বানানো হত টক ডাল। বাসি পাঁউরুটি দিয়ে মা বানাতো দারুণ একটা তরকারি। শুধু তাই নয়, বাড়িতে রসগোল্লা এলে মিষ্টি খাবার পর সেই রস চলে যেত চাটনিতে। মাটির হাঁড়িটায় গাছের চারা পুঁতে বানানো হত টব। অল্প দিয়ে সংসার কীভাবে চালাতে হয় সেটা ছিন্নমূল বাঙালদের মতো ভাল আর কেউ জানে না।'

বাইরে মেঘ ডাকছে শব্দ করে। তিথি উঠে বাইরে গিয়ে আকাশ দেখে এল। বলল, 'সারাদিন বৃষ্টি হয়ে দুপুর থেকে একটু ধরেছিল। মনে হচ্ছে আজ বিকেল থেকে আবার ভাসাবে।' যোগমায়া কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দরজায় টোকা পড়েছে। তিথি উঠে গিয়ে দরজা খুলে এল। সুমন ঘরে এসেছে। তিথি বলল, 'স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরি করলে যে?'

সুমন হাসল, 'মধুসূদনদা'র আজ মনমেজাজ খুব ভাল ছিল। ছুটির পর একটার পর একটা গান শোনাল। ভাওয়াইয়া, দরিয়া, চটকা। আমি আর আমাদের স্কুলের বিপ্লবদা বসে বসে শুনছিলাম মধুসূদনদার গান। তাই একটু দেরি হয়ে গেল।'

তিথি বলল, 'বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হতে চলল। সেই সকালে দু'টো নাকেমুখে গুঁজে স্কুলে গিয়েছ। কতক্ষণ হয়ে গেল না খেয়ে আছ, পেটে তো চড়া পড়ে গিয়েছে। কী খাবে এখন? রুটি করে দেব?'

সুমন ঘরে ঢুকে শার্টটা খুলে আলনায় রেখে এসে বলল, 'এখন আর রুটি করতে হবে না, বরং একটু মুড়ি দাও।'

তিথি একটা বড় বাটিতে করে দুধ-মুড়ি নিয়ে এসেছে। বাটিটা হাতে নিয়ে সুমন শিশুসুলভ গলায় বলল, 'মা, আজ বড্ড খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে। আজ রাতে খিচুড়ি হলে কেমন হয়?'

যোগমায়া হেসে ফেলে বললেন, 'আমারও মনটা আজ খিচুড়ি খিচুড়ি করছে। মুগডালের খিচুড়ি আর বেগুনভাজা, সঙ্গে ডিমের কষা।'

তিথি বলল, 'মা, আজ তোমার বিশ্রাম। আজ আমিই রান্না করব।'

যোগমায়া তিথির চিবুক ছুঁয়ে হেসে বললেন, 'আমি যতদিন আছি ততদিন তোমার রান্নাঘরে ঢোকার প্রয়োজন নেই। আমি যখন থাকব না তখন তো তোমাকেই হেঁসেল সামলাতে হবে।'

সুমন হেসে বলল, 'আহা করতে চাইছে যখন তখন করুক না। এতদিন মায়ের হাতের রান্না চেটে চেটে খেয়েছি একদিন না হয় বউয়ের হাতের রান্না একটু চেখে দেখি।'

তিথি যোগমায়ার কাঁধে নাক ঠেকিয়ে আবদার করল, 'উঁহু আজ কোনও বারণ শুনব না। আজ আমিই রাঁধব।'

যোগমায়া বললেন, 'ঠিক আছে। তবে দিনের আলো মরে আসছে। সন্ধে হয়ে গেলে আর কিছুই দেখা যাবে না। উঠোনটায় আগাছা হয়েছে খুব। সাপখোপ থাকা বিচিত্র নয়। তাছাড়া বড্ড পিছলও হয়েছে। হাতে একটা টর্চ নিয়ে চলাফেরা কোরো। রান্নাঘরে অসুবিধা হলে বা আমার সাহায্য লাগলে আমাকে ডেকো।'

তিথি একগাল হেসে বলল, 'আচ্ছা।'

২৪

উৎপলেন্দু আগে ন'মাসে ছ'মাসে একদিন মদ্যপান করতেন। তিথি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর সন্ধেবেলা করে নিয়মিত হুইস্কি পানের একটা অভ্যাস হয়েছে উৎপলেন্দুর। দু-আড়াই পেগের বেশি অবশ্য খান না। কিন্তু ওটুকু না হলেই যেন নয়। মিমি প্রথম প্রথম অনেক বারণ করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

বিমলেন্দু তাঁর স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে দিল্লি ফিরে গিয়েছেন গত সপ্তাহে। ভাই আর ভাইয়ের বউকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন বিমলেন্দু, একবার পাতাঝোরা গিয়ে তিথিকে একবার দেখে আসার জন্য। মাধবীও অনেক করে বুঝিয়েছেন সুমনকে জামাই হিসেবে মেনে নেবার জন্য। রাজি হননি উৎপলেন্দু কিংবা মিমি। এত ঘটনার পর পাতাঝোরায় যাওয়া মানে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। জীবন থাকতে সে কাজ তাঁরা আর পারবেন না।

কাল সন্ধে থেকে গভীর রাত অবধি সিডি বাজিয়ে সেতারে মালকোশ শুনেছেন উৎপলেন্দু। কাল মদ খাওয়া একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। চার পেগ অ্যালকোহল তাঁর রক্তে মিশে যাবার পর অনেক রাত পর্যন্ত অন্ধকারে, জানালার ধারে বসেছিলেন উৎপলেন্দু। সেতারের ধুন তাঁকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল গভীর, নিরুচ্চার স্নিগ্ধ কোনও হ্রদের জলে। সেই শান্ত অবগাহনের কোনও তুলনা নেই।

মিমি টিভি সিরিয়াল দেখছিলেন ড্রয়িংরুমে। চারতলা বাড়ির এই জানালাটা দিয়ে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। দেশলাই বাক্সের মতো ছোট ছোট বাড়ি, আলোর ফুটকি। সেদিকেই তাকিয়ে ছিলেন উৎপলেন্দু। মগ্ন ছিলেন সেতারের মূর্ছনায়।

মালকোষ তাঁর প্রিয় রাগ। রাতের অন্ধকারে মালকোষ শুনলে স্নায়ুগুলো কেমন যেন অসাড় হয়ে যায়। উঁচু দিকের পর্দাগুলোয় কতগুলো ঢেউয়ের ধাক্কা দিয়ে যখন গম্ভীর খাদে গড়িয়ে নামে তখন কেমন যেন করতে থাকে বুকের ভেতরটা। মৃদু একটা শিরশিরানি ছড়িয়ে থাকে শরীরে। সুরের চড়াই-উৎরাইগুলো পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেয় তাঁকে। একটা অদ্ভুত শূন্যতায় ছেয়ে যায় মনটা। শুধু মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন হারিয়ে গিয়েছে জীবন থেকে।

তখন নেশা হয়ে গিয়েছে অনেকটা। তার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ দহনজ্বালার পর আবার স্নিগ্ধ একটা অনুরণন ছড়িয়ে পড়ল শরীরে, মনে। একটা অদ্ভুত আবেশ এসে জারিত করে দিল উৎপলেন্দুর অন্তঃপুর। মনে হল ছায়া ছায়া একটা অবয়ব নিয়ে কেউ যেন পাশে এসে বসেছে। যেন কোমল হাতে আলতো করে মাথায় আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে কেউ। সে এক ব্যাখ্যাতীত অনুভূতি।

রাতে শরীরটা একটু যেন কেমন কেমন করছিল। তাই আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল না। বিছানায় শুতে শুতেই চোখ জড়িয়ে এল। এলোমেলো ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু দৃশ্য চোখে এসে ভিড় জমাল। কী দেখেছেন সেসব ঠিক মনেও নেই। চারটের দিকে একবার টয়লেট থেকে ঘুরে এলেন উৎপলেন্দু। তারপর একেবারে ভোররাতে তিথিকে স্বপ্ন দেখলেন উৎপলেন্দু। একেবারে স্পষ্ট স্বপ্ন।

মেঘের গায়ের রঙের মতো কালো আকাশের প্রেক্ষাপটে আদিগন্ত সবুজ এক ধানখেত। সেই ধানখেতের দীর্ঘ আলপথ দিয়ে চপল পায়ে হেঁটে চলেছে তিথি। খোলা একঢাল কালো চুল, পরনে লাল পাড় সাদা গরদের শাড়ি। উৎপলেন্দু পিছন পিছন দৌড়চ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছেন না তিথির। দূর থেকে উঁচু গলায় ডাকছেন মেয়েকে, ডেকেই চলেছেন। কিন্তু তার ডাক যেন শুনতেই পাচ্ছে না তিথি। পিছন দিকে না তাকিয়ে হেঁটেই চলেছে আলপথ দিয়ে। একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল তিথি। উৎপলেন্দু এসে পড়েছেন মেয়ের একদম পিছনে। ঘাড় ঘুরিয়েছে তিথি। তিথির কপালে দগদগে সিঁদুর, দু'চোখে টাপুর টুপুর জল।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল যেন। কু-ডাক ডেকে উঠল ভেতর থেকে। উৎপলেন্দু গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'কী হয়েছে রে তিথি? তোর চোখে জল কেন?'

তিথি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল একটুক্ষণ। কিছু একটা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল শব্দ না করে। একটা অব্যক্ত ব্যথায় ভারী হয়ে এল উৎপলেন্দুর বুক। মেয়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'তিথি, তোর কষ্ট হচ্ছে? কে তোকে কষ্ট দিয়েছে তার নামটা আমাকে বল একবার।'

তিথি কিছু বলল না। সহসা মুখ ফিরিয়ে নিল। হনহনিয়ে খয়েরি আলপথ দিয়ে হেঁটে চলে গেল উৎপলেন্দুকে পেছনে ফেলে দিয়ে। লালপাড় সাদা গরদের শাড়ি মিলিয়ে গেল সবুজ ধানপথের আড়ালে।

স্বপ্নটা দেখার পর থেকেই মনটা কেমন যেন ছটফট করছে উৎপলেন্দুর। কতদিন হয়ে গেল তিনি দেখেন না মেয়েটাকে!

স্বপ্নটা দেখার পর এপাশ ওপাশ করেছেন আর ঘুম আসেনি চোখে। স্বপ্নের কথাটা মিমিকে বলব বলব করেও বলেননি উৎপলেন্দু। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি এসে ঘুরপাক খেতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে।

সকালবেলা অফিস যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন উৎপলেন্দু। মিমি একচিলতে কিচেনে খুটুর খুটুর করছেন। সকালের এই সময়টায় মরার সময় নেই তাঁর। সকালে ঘুম থেকে উঠে ডাল ভাত আর মাছের ঝোল রান্না করা হয়ে গিয়েছে। এখন উৎপলেন্দুর টিফিন বক্সে মাখন লাগানো দু'পিস পাঁউরুটি আর একটা ডিমসেদ্ধ ঢুকিয়ে দিলেন ব্যস্ত হাতে।

উৎপলেন্দু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট বাঁধছিলেন। হাঁক দিয়ে বললেন, 'এই যে শুনছ? চশমাটা খুঁজে পাচ্ছি না। একটু এনে দেবে?'

মিমি রান্নাঘর থেকে বেরোলেন। এদিক সেদিক খুঁজে টেবিলের উপর থেকে চশমা খুঁজে নিয়ে এসে মুখের একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'এই নাও। কী হয়েছে তোমার বলো তো? বুড়ো মানুষের মতো দেখছি ভুলে যাচ্ছ সব।'

উৎপলেন্দু রসিকতা করে বললেন, 'আমার বাহান্নতেই বাহাত্তুরে ধরেছে বোধহয়।'

মিমি ছদ্মকোপ দেখিয়ে বললেন, 'সে আর আমার বুঝতে বাকি নেই। বাড়িতে যে আর একটা মানুষ আছে সেটা মনে আছে তোমার? যাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছ তার কথা তো ভুলেই গিয়েছ একরকম। যে রেটে মেমোরি লস করছ এরপর তো সব কিছুই ভুলে যাবে তুমি।'

দেয়ালে তিথির একটা ফোটো টাঙানো। একটা ট্রফি হাতে দাঁড়িয়ে আছে তিথি। বহুদিন আগের ফোটো। তিথিদের নাচের স্কুলের একটা ফাংশান ছিল। কথক নেচে সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছিল মেয়ে। সেই ফোটোর দিকে তাকিয়ে অন্যরকম গলায় বললেন, 'অনেক কিছুই তো ভুলতে চাই মিমি। জটিল কোনও রোগে যদি সত্যিই সত্যিই সব স্মৃতি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যেত তবে মন্দ হত না।'

মিমি চিন্তিত গলায় বললেন, 'তুমি এবার ডাক্তার দেখাবে। নিজের জিনিস কোথায় কখন রাখো নিজেই ভুলে যাও। আমার ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়ে গেলে তুমি টের পাবে কত ধানে কত চাল।'

শব্দ করে বেসফোন বাজল। উৎপলেন্দু হাতে ধরা সুটকেসটা সেন্টার টেবিলের উপর রেখে দ্রুত হেঁটে গিয়ে ফোনটা ধরলেন। স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'উৎপলেন্দু চ্যাটার্জি বলছি।'

টেলিফোনের ওপাশ থেকে একটা অচেনা গলা ভেসে এল, 'আমি সুমন। একটা জরুরি খবর দেবার জন্য আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

উৎপলেন্দু ভুরু জড়ো করে বললেন, 'কোন সুমন? কী ব্যাপারে আমাকে ফোন করেছেন বলুন তো?'

ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর বলল, 'আমি সুমন। সুমন রায়। পাতাঝোরা থেকে ফোন করছি।'

উৎপলেন্দু থমকালেন। একবার দাঁতে দাঁত পিষলেন। আগের থেকেও গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী বলবে বলো। আমার অফিস যাবার তাড়া আছে।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। নিশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে যেন। দুর্বল গলায় সুমন বলল, 'একটা খারাপ খবর আছে।'

উৎপলেন্দু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?'

সুমন কেমন একটা গলায় বলল, 'তিথি... তিথি আর নেই।'

উৎপলেন্দু কথাটার অর্থ বুঝলেন না। তবুও মনে হল পৃথিবীটা বুঝি দুলছে। বিহ্বল গলায় বললেন, 'মানে?'

সুমন আবার বলল, 'তিথি আর নেই।'

উৎপলেন্দু চিৎকার করে বললেন, 'নেই মানে? কী যা তা বলছ? কী হয়েছে তিথির?'

মিমি উৎপলেন্দুকে উঁচু গলায় কথা বলতে দেখে চলে এসেছেন পাশে। উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে আছেন টেলিফোনটার দিকে।'

সুমন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছে ওপাশে। ভেঙেপড়া গলায় বলল, 'কাল রাতে বাড়িতে সাপ কামড়েছিল। হেলথ সেন্টারে নিতে নিতেই সব শেষ হয়ে গেল... কিচ্ছু করতে পারলাম না।...'

উৎপলেন্দু ফোনটা ছেড়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। মনকে নিজে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সুমন কি সত্যি কথা বলছে? হতেই পারে না। অসম্ভব। নির্ঘাৎ শ্বশুরে কাছ থেকে টাকা হাতাবার কোনও ফিকির করছে শয়তান ছোকরা।

ধুপ করে কিছু একটা গড়িয়ে পড়ার শব্দ এল কানে। উৎপলেন্দু তাকিয়ে দেখলেন তাঁর পাশে দাঁড়ানো মিমি এলিয়ে পড়ে যাচ্ছেন। বুকে হাত, চোখেমুখে প্রবল যন্ত্রণার ছাপ।

উৎপলেন্দু কোনওমতে মিমিকে ধরে ফেললেন পড়ে যাবার আগে। শুইয়ে দিলেন বিছানায়।

উৎপলেন্দুর মাথা কাজ করছে না। নিজের মোবাইল ফোনটার কথা তাঁর আর মনে পড়ল না। বেসফোনের পাশে একটা ডায়েরি আছে। ডায়েরিটা ঘেঁটে একটা নম্বর ডায়াল করলেন। হড়বড় করে বললেন, 'দীপক, দীপক, কোথায় আছ তুমি?'

টেলিফোনের ওপাশে দীপক ক্যাজুয়াল গলায় বললেন, 'এই তো বাজার-টাজার করে বাড়িতে দিয়ে এখন একটু সাইটের দিকে যাচ্ছি। কেন বলুন তো?'

উৎপলেন্দুর স্বর কাঁপছে, 'একটু আসতে পারবে?'

দীপক সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, 'আপনার গলা এমন কাঁপছে কেন? কী হয়েছে? শরীর ঠিক আছে তো?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'তোমার দিদির শরীরটা খারাপ হয়েছে হঠাৎ করে। আনকনশাসের মতো... স্ট্রোক কিংবা হার্ট অ্যাটাক মনে হচ্ছে।'

দীপক চিন্তিত স্বরে বললেন, 'কী বলছেন উৎপলদা?'

উৎপলেন্দু বিড়বিড় করে বললেন, 'এদিকে সুমন ফোন করেছিল পাতাঝোরা থেকে। তিথিও নাকি...'

দীপক বললেন, 'তিথির কী হয়েছে?'

উৎপলেন্দু ঠোঁট চেটে বললেন, 'দীপক, আমার... আমার মাথা কাজ করছে না। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না।'

দীপক ব্যস্ত স্বরে বললেন, 'ইমিডিয়েটলি দিদিকে নার্সিংহোমে দিতে হবে। মার্চেন্ট রোডের নার্সিংহোমটায় আমার চেনাজানা আছে। ওখানেই আপাতত অ্যাডমিট করিয়ে দিই, তারপর দেখা যাবে। আপনি স্টেডি থাকুন। আমি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি।'

উৎপলেন্দু মোবাইলের অ্যাড্রেস বুক ঘাঁটছিলেন। তিথির বন্ধুদের কাউকে এ সময় পেলে ভাল হত। নীলের ফোন নম্বর সেভ করে রেখেছিলেন কখনও। পেয়ে গেলেন অবশেষে। নীলকে ফোন করতেই নীল হালকা গলায় বলল, 'কেমন আছ তোমরা?'

উৎপলেন্দু দুর্বল গলায় বললেন, 'ভাল নেই রে। তোর কাকিমা হঠাৎ অসুস্থ হয়েছে।'

নীল উদ্বিগ্ন হল, 'কী হয়েছে? এনিথিং সিরিয়াস কাকু?'

উৎপলেন্দু বললেন, 'হ্যাঁ সিরিয়াস তো বটেই। হঠাৎ করে অনকনসাস মতো মনে হচ্ছে নার্সিংহোমে নিতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে।'

নীল বলল, 'তুমি স্টেডি থাকো কাকু। আমি আমাদের গ্রুপটাকে খবর দিয়ে দিচ্ছি। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই নার্সিংহোমে পৌঁছচ্ছি।'

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

অঙ্কন : সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী

একটি সন্ধে ও নায়ক হওয়ার ইচ্ছে

রম্যাণী গোস্বামী

'আরে এসো এসো রমেশদা। খবর কী? বউদি ভাল আছে তো? এহে, মুখটা তো দেখছি ঘামে চুপসে গিয়েছে একদম। যা গরম। চা খাবে? না কোল্ড ড্রিঙ্ক?'

—দাঁড়া, দাঁড়া ভাই। আগে একটু ঘুরে দেখি তোর নতুন দোকান। বাব্বা, তা ভালই তো সাজিয়েগুছিয়ে নিয়েছিস রে! বেশ বড়ই জায়গা তো। ব্যাঙ্কের লোন কতদিন শুধতে হবে?

—সে তো অনেক দিনের গল্প। এই দেখ, এদিকটায় সোফা-টোফা দিয়ে সাজিয়েছি। খদ্দেররা একটু আরামে বসবে। অফিসিয়াল ফর্মালিটিগুলো সারবে। আর এপাশে এইটুকু গ্রিনারির আইডিয়াটা কিন্তু তোমাদের শ্রাবণীর। আজকাল বড় বড় জায়গায় দোকানে, শো-রুমে, হোটেল-টোটেলের এক কোণে নাকি সবুজ গাছপালা রাখাটা ভীষণ ইন। দু'টো ছেলে রেখেছি দেখভালের জন্য। বাকিটা তোমাদের আশীর্বাদ।

—শ্রাবণী কেমন আছে রে? ওর নাচের স্কুল কেমন চলছে?

—ভালই চলছে। তুমি তো অনেকদিন আসো না আমাদের বাড়িতে। সেই গতবছর মিন্টুর মুখেভাতের সময় এসেছিলে। একদিন সময় করে চলে এসো না বউদিকে নিয়ে। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। ওদলাবাড়ি থেকে মালবাজার। বাসে তো বড়জোর আধঘণ্টা...। ওহো, তোমার তো স্কুটারই আছে। বলো এবার, আছো কেমন গুরু?

—আসলে একটা দরকারে এসেছিলাম তোর কাছে। তা, তুই ঝাঁপ বন্ধ করবি কখন? একটু কথা বলা যাবে?

—আরে এখনই কী? সবে তো ছ'টা। চলো বসি। শালা, একটা কাস্টমারও নেই আজ। কী কথা? বলো তো? এনিথিং সিরিয়াস? দাঁড়াও আগে দু'টো চা বলি। হ্যাঁ, এবার বলো।

—ইয়ে, মানে, তোর তো বাইকের ব্যবসা। আমাকে একটা ইনফরমেশন দিতে পারিস?

—নিশ্চয়ই পারি। কী ইনফরমেশন? আস্ক মি এনিথিং অ্যাবাউট টু হুইলারস।

—জন আব্রাহাম কী ধরনের বাইক চালায় বলতে পারিস?

—কী? কে? কার কথা বলছ?

—জন আব্রাহাম।

—মানে? কে? জন! ধুম মচালে? বলিউড অ্যাক্টর? কেস কী বলো তো?

—তাই হবে হয়তো। টিভিতে সর্বক্ষণ দেখায় যখন। নামটা সোনা'র কাছেই শুনলাম।

—কী ধরনের বাইক চালায় প্রশ্নটা ক্লিয়ার হল না বস। সে তো কত মুভিতে কতরকম বাইক চালায়। একটু খুলে বলবে রমেশদা? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

—আরে, বুঝতে কি আমিই পারছি রে? ঘটে তো আমারও কিছু ঢুকছে না জাস্ট!

—কুল ডাউন। নাও। চা'টা খেতে খেতে বলো, কেসটা কী?

—দাঁড়া, তাহলে তোকে বলি প্রথম থেকে। ওদলাবাড়ির ওই পাড়াতেই তো তুই কিছুদিন থাকতিস। আমাদের বাড়িটাও তুই দেখেছিস। বাপ ঠাকুরদার আমলের ভাঙাচোরা একটা বাড়ি। কেউ সারায়ওনি। আমার বিয়ের আগে একবার সামনেটা রং করে কলি ফেরানো হয়েছিল। তারপর থেকে যেমন তেমন পড়ে আছে।

—হ্যাঁ, তো?

—তো সেই ভাঙা বাড়িতেই বছর পনেরো আগে বেনারসি শাড়ির ঘোমটার আড়ালে লাজুক হাসিটা নিয়ে আমার ঘরণী হয়ে এসেছিল তোর বউদি।

—হ্যাঁ, তোমার বউভাত খেয়েছিলাম তো। মনে আছে সব। তো কী হল?

—সম্বন্ধ করে বিয়ে। তবুও দিব্যি ভাব ভালোবাসা হল আমাদের। সেই সাদামাটা ঘরেও কেমন যেন আলো হয়ে গেল। কী রে? আমার কথাগুলো শুনে হাসছিস? মনে হচ্ছে রমেশদাটাও বড়ো হয়ে গেল? ছিয়াত্তরে পেল?

—না, না। তা নয়। আসলে তোমার বউভাতের ঠিক পরে পরেই ঠেকে কারওর সঙ্গে একটা বেট ধরেছিলাম আমি। হেরে ভূত! কে যে ছিল মালটা তা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। একশো টাকার বাজি। আজ এতদিন বাদে সেটা মনে পড়ে গেল।

—কীরকম কীরকম? কী নিয়ে বেট ধরেছিলি?

—তুমি তো ঠেকে সাঙ্ঘাতিক রেগুলার ছিলে। তোমার হয়ত মনে আছে। সাতটা, ম্যাক্সিমাম সওয়া সাতটা। তার বেশি দেরি হয়নি কোনওদিন। তাই নিয়েই বেট। মোটামুটি সবাই ধরে নিয়েছিল তুমি সেদিন আসবেই না। এলে ঠেক ভাঙার মুখে মান বাঁচাতে একটা ফর্মাল ভিজিট।

—আর তুই? তুই সবার উল্টোদিকে? একা?

—আমি? আমি তো তোমার ভীষণ ভক্ত ছিলাম সেই ছোটবেলা থেকে। পাড়ার ফুটবল টিমে তোমার বল নিয়ে ড্রিবল করা থেকে শুরু করে লোকাল রবীন্দ্রজয়ন্তীর জলসায় তোমার ভরাট গলার হেমন্তের গান, তখন সবই হাঁ করে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখি। ফলো করার বৃথা চেষ্টা করি। আমার হিরোর এত বড় আদর্শচ্যুতি কেন যেন মেনে নিতে পারছিলাম না জানো? একগুঁয়ের মতো বেট ধরে বসলাম যে তুমি আসবে, আর সওয়া সাতটার মধ্যেই। বাপের হোটেলে থাকি তখন। অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স নিয়ে পড়ি। একশো টাকার ভ্যালু কিন্তু অনেকটা ছিল আমার কাছে। তুবও জেদ করে...।

—তারপর? আমি সেদিন আসিনি না?

—সেদিন? তারপর গোটা হপ্তা তোমার আর পাত্তা নেই। এলেও যখন তখন তোমার চোখেমুখে একটা অদ্ভুত তৃপ্তির ঝলক, অন্যরকম কনফিডেন্সের ছাপ। ঠেকে তো সবাই আমাকে খেপিয়ে অস্থির। আর তোমার ওই সময় থেকে একটা নতুন নাম তৈরি হয়ে গিয়েছিল, জানো? রমেশ সেনাপতি'র একটু মডিফায়েড ভার্সান।

—তাই? জানতাম না তো? কী সেটা?

—রমেশ 'সেনাপতি'। কারণ আমরা সবাই জানতাম যে বউদির ডাকনাম সোনা।

—হা হা হা। দেখ তো, আমার জন্য তোর টাকাগুলো গচ্চা গেল। কোনও মানে হয়?

—তা যাক। কিন্তু প্রথম রোমান্সের হাতেখড়ি আমার ওই ঘটনা থেকেই। তারপর থেকে সন্ধেবেলা কোনও বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছি, হাওয়ায় জানালার ছিমছাম পর্দা উড়ছে, ভিতরে ফ্যান ঘুরছে। রেডিয়োতে ভেসে আসছে গানের সুর। আমার মনটা অকারণে আনচান করে উঠেছে। তারপর তো এই জায়গাটা ছেড়ে মালবাজারে চলে এলাম। এখানে এসে শ্রাবণীর সঙ্গে আলাপ। প্রেমপর্ব। জীবনটা অন্য খাতে বইতে শুরু করল। যাক গে, কী বলছিলে বলো তো।

—বলছিলাম যে, তোর বউদি মানে সোনা সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল দিব্যি হাসিমুখে। কখনও কোনও অভিযোগ, খিটিরমিটির করেনি তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। কত সংসারেই তো শুনতাম কতরকমের ঝামেলা হয় চাওয়া পাওয়ার অমিল নিয়ে। ওর শিলিগুড়ির বোন ভগ্নিপতি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেল পৈত্রিক বাড়ি প্রোমোটারকে দিয়ে। ঝাঁ চকচকে বাইশশো স্কোয়্যার ফুটের অ্যাপার্টমেন্ট, আধুনিক কেতার মডিউলার কিচেন, সাউথ ফেসিং ব্যালকনি আর জানালা থেকে হু হু হাওয়ার লুটোপুটি। শালা, বাড়ি না তো, যেন স্ট্রেট স্বর্গে প্রবেশ। দুপুরে গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নটা ছিল। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরলাম। রাতে জাস্ট দু'টো রুটি খেয়ে শুয়ে পড়ব। গা ধুয়ে এসে টিভিটা চালিয়ে কী একটা বলতে ঢুকেছি রান্নাঘরে, তাকিয়ে দেখলাম ওকে। স্যাঁতস্যাঁতে পুরনো একতলা বাড়ির তেল চিটচিটে রান্নাঘরের দমবন্ধ ভ্যাপসায় দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামতে ঘামতে সে রুটি বেলছে। সিম্পলি হাসিমুখে। তখন ওর বয়স আর কত? চার বছর হল বিয়ে হয়েছে।

—তুমি সত্যিই ভাগ্যবান রমেশদা!

—হ্যাঁ রে ভাই। তাই তো মন থেকে মেনে এসেছি এতদিন। কিন্তু রিসেন্টলি একটা ব্যাপারে... ওই যে তোকে যেটা বলছিলাম।

—কী বলছিলে?

—কোন কুক্ষণে যে সেদিন পাড়াতুতো এক ননদকে নিয়ে মালঞ্চতে ওই সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিল তোর বউদি। যতসব! বিকেলে তো স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে হলের সামনেটা চৌরাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না। তার মধ্যেও গুঁতোগুঁতি করে গেল।

—কী সিনেমা?

—ওই যে তুই বললি, 'ধুম' না কী যেন নাম! তা গিয়েছে যাক। আমার এসবের শখ নেই বলে যে আর কারওর থাকবে না তা তো নয়। তাছাড়া ছেলেপুলেও নেই। কী নিয়েই বা থাকবে বেচারি। কিন্তু জানিস? বাড়ি ফিরে আসা ইস্তক দেখলাম কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটাচলা করছে তোর বউদি। কিছু জিজ্ঞেস করছি, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে কেমন ভাসা ভাসা দায়সারা উত্তর দিচ্ছে। ইয়ে মানে, রাতের ব্যাপারটাতেও বিশেষ কোনও সাড়া নেই। বুঝতেই তো পারছিস!

—বলছ কী? তারপর?

—এভাবে দু'তিন দিন গেল। অতটা আমল দিইনি প্রথমে। ভেবেছিলাম ঠিক হয়ে যাবে।

—হল না ঠিক?

—শোন না। সেদিন কিছু মাসকাবারি বাজার করতে যাওয়ার ছিল চৌপতির কাছে ঘোষেদের দোকানে। প্রত্যেকবার তোর বউদি সঙ্গে যায়। জিনিসপত্র কিনে আমরা বাড়ি ফেরার সময় চিলড্রেনস পার্কটার কাছে দাঁড়িয়ে চাট খাই। ও ফুচকা ভীষণ ভালবাসে। বাচ্চাদের মতো হইহই করে মিনিমাম পনেরোখানা তো খাবেই। আমি ওকে তৈরি হতে বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করছি বাড়ির বাইরে। স্টার্ট দিলাম। খানিকক্ষণ চলার পরই বলল, বাড়ি ফিরে যাবে। কারণ জিজ্ঞেস করলাম। কোনও উত্তর নেই। তখন গলির মোড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠেছি সবে। আবার স্কুটার ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরতে হল। বাড়িতে ফিরতেই দেখি সে গটগট করে বসার ঘরে ঢুকে গোমড়া মুখে ধপাস করে সোফায় বসে পড়ল।

—কেন? শরীর খারাপ লাগছিল?

—না না, সেসব কিছু নয়। আমার ঘাবড়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে কী বলল জানিস? বলল, তোমার ওই ভাঙা স্কুটারে আর চড়ব না, বিচ্ছিরি! আলাদা আলাদা বসা কেমন ড্রাইভার প্যাসেঞ্জারের মতো। তাছাড়া কেমন একটা ভ্যাটভ্যাট করে আওয়াজ হয়। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর মুখ টিপে হাসে। আমার ভীষণ লজ্জা লাগে। যাও তুমি একা একা।

—বউদি তাই বলল? হা হা হা।

—তুই হাসছিস? আমি তো শুনে থ মেরে গেলাম। আমার

শিশুবেলাই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়

সুস্মিতা চন্দ
প্রিন্সিপাল

শিশু বেলা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই যেমন একমাত্র উপভোগ করা যায় জীবনের অনাবিল আনন্দ আর সেই আনন্দের মুহূর্তগুলোকে আমরা বয়ে বেড়াই জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত। কিন্তু আবার শিশুবেলাই আমাদের জীবনে যে কোনও ভালো অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময়। এ সময় আমাদের মস্তিক থাকে ভীষণ রকম সক্রিয়, যার ফলে এই সময়েই একটি শিশু অনেক সহজেই যে কোনও কিছু আত্মস্থ করে নিতে পারে এবং যা মনে থেকে যায় তাদের শেষ জীবন পর্যন্ত।

একটি শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে দু'বছর থেকে চার বছরের মধ্যে। আগে এই মানসিক বিকাশের দায়িত্ব নিত যৌথ পরিবার। এখন তো আর যৌথ পরিবার দেখা যায় না, তাই এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে 'Play School'-এ যাওয়ার। 'STEP KIDS' এরকমই একটি Play School যা শিশুদের মানসিক এবং সামাজিক বিকাশ নিয়ে কাজ করে। চেষ্টা করে তাদের বাবা-মাকে শিশুবেলার গুরুত্ব অনুভব করাতে সেই সময়ের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ। তাকে উৎসাহিত করবে আগামী দিনগুলোকে সুন্দর করে তোলবার জন্য। 'STEP KIDS' এই কাঁধ শক্ত করার কাজটি করে থাকে, যাতে আপনার শিশুটি হয়ে ওঠে একজন জাতির ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ এবং অবশ্যই আপনার ভবিষ্যৎ।

Step KIDS আপনার শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একটি যৌথ পরিবার

(A house of Tiny Tots) 43, Sarat Bose Road, Hakimpara, Siliguri, Phone 98320 41300

‘ধুর শালা! তুইও কি পাগল হলি? আমি কি একটা গান্ডু নাকি? আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের জমানো টাকা উপুরহস্ত করে দিলেও ওই জিনিস আসবে না সেটা আমার জানা আছে। ছোটমোট সরকারি কেরানি। ক'টা টাকাই বা মাইনে পাই বল?’

এতদিনের সঙ্গী আমার টু স্ট্রোক স্কুটার। আমার প্রাণ! এ তল্লাটে যখন আমার স্কুটার ছিল তখন অনেকেই সাইকেলে চড়ত। এত যত্নে রেখেছি। কয়েকটা জায়গায় একটু তুবড়েছে বলে তাকে ভাঙা বলবে? জানিস? কতদিন দু'জনে ওতে চেপে ঘুরে বেড়িয়েছি এই ডুয়ার্সের আনাচে-কানাচে। চা-বাগানে, জঙ্গলে, নদীর ধারে। গরুমারা ফরেস্টের ভিতরের কোর এরিয়াতেও চলে গিয়েছিলাম একবার গার্ডের চোখ এড়িয়ে। সে কী উত্তেজনা সোনা'র। যদি আচমকা হাতি বেরোয়?

—তারপর সেদিন কী হল?

—তারপর ও আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে টিভিটা চালিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল স্ক্রিনের দিকে। তখনই দেখলাম সেই সিন। ঝাঁ চকচকে বিদেশি রাস্তা রোদ্দুরে ঝলকাচ্ছে। একটা হেবি বডি বানানো ছোকরা, দারুণ দেখতে একটা বিশাল বাইকে চেপে সাঁ সাঁ করে হাওয়ার গতিতে ছুটে চলেছে ওর উপর দিয়ে। ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক চলছে, ধুম... ধুম...! একটা ছোটমতো জামা পরা ইয়াং মেয়ে বাইকের পিছনের অ্যাত্ত উঁচু সিটে বসে দু'হাত দিয়ে ছেলেটাকে জাপটে ধরল আর তোর বউদির চোখদু'টো চকচক করে উঠল আনন্দে। দেখলাম ওর মুখটা ধীরে ধীরে নরম হয়ে যাচ্ছে ওই দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। আমার না? বুঝলি? রাগে গাঁটা চিড়বিড় করে উঠল ওদিকে তাকিয়ে।

—নিশ্চয়ই সেই জন আব্রাহাম। হা হা হা। পারোও তুমি মাইরি!

—না রে। যেটা জীবনেও হয়নি আমাদের মধ্যে সেটা হল সেদিন।

—কী? ঝগড়া?

—হ্যাঁ, আমি খুব রেগে গেলাম। বললাম যে আর আমার স্কুটারে চড়তে হবে না তোমায়। তোর বউদিও পাল্টা জবাব দিল। এবার থেকে কোথাও গেলে নাকি সে অটোতে বা রিকশায় চড়েই যাবে। তারপর থেকে ক'দিন ধরে মনটা এত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে তাড়াতাড়ি অফিস সেরে বাড়ি ফেরার পথে তোর কাছে ছুটে এলাম।

—আচ্ছা, তুমি কি পাগল হলে? শোনো রমেশদা, তুমি কী বলতে চাইছ আমি কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ওই ধরনের স্পোর্টস বাইকের দাম জানো? শুনলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া ওসব মাল আমার শো-রুমে একখানাও নেই। ওগুলোর যা মেইন্টেন্যান্স চার্জ! এই মফস্‌সলে কে কিনবে? তুমি বরং শিলিগুড়ির শো-রুমগুলিতে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো।

—ধুর শালা! তুইও কি পাগল হলি? আমি কি একটা গান্ডু নাকি? আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের জমানো টাকা উপুরহস্ত করে দিলেও ওই জিনিস আসবে না সেটা আমার জানা আছে। ছোটমোট সরকারি কেরানি। ক'টা টাকাই বা মাইনে পাই বল?

—তবে? তবে কী করতে চাইছ তুমি?

—ওই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আর কী! ভেবেছিলাম যে আর তোর কাছে যদি ওর চাইতে অনেক কম রেঞ্জের কিছু পাওয়া যায়, যা দিয়ে তোর বউদির মুখে হাসি ফোটাতে পারি, তবে স্কুটারটা বেচে কিছু টাকা জোগার করব। আর বাকিটা... কিন্তু যা দেখলাম তাতে...

—তাতে কী রমেশদা? কী হল? চুপ করে আছো কেন? কোনটা পছন্দ হয়েছে শুধু বলো। রেট ফেট নিয়ে চিন্তা কোরো না। ও আমি ঠিক অ্যাডজাস্ট করে দেব। দরকার হলে লোন-টোন কিছু একটা...

—ওরে পাগলা! বাইক কেনাটাই যে বড় কথা নয়। খোলনলচে পাল্টালে কি আসল মানুষটাও পাল্টে যায়? পাল্টানো সম্ভব আদৌ? কিনলেই হবে? নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মেশাতে হবে না? খাপ খাওয়াতে হবে না? যা স্যাম্পেল দেখছি তোর এখানে তাতেই তো মাথা ঘুরে যাচ্ছে। ধুর! এই সব রংচঙে স্টাইলিশ জিনিসে কি আমাকে মানায় রে? সে বয়স কি আর আছে? তোর বউদিকেই বা বসাব কোথায়? এই উঁচু সিটে সে বসবে তাঁতের শাড়ি পরে? এলো খোঁপায় আধখানা ঘোমটা মাথায়? ওকে কেমন দেখাবে ভাবলে বরং হাসিই পাচ্ছে এখন। ভালই হল তোর এখানে এসে। বুদ্ধুর মতো অবাস্তব একটা চাওয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলাম। ইচ্ছেটা মরে গেল। বাঁচা গেল।

—চলে যাচ্ছ রমেশদা?

—উঠি রে। সোনা অনেকক্ষণ বাড়িতে একা আছে। অফিস থেকে ফিরতে এত দেরি তো হয় না। হয়ত চিন্তা করছে অল্প।

—একবার একটু ওপাশটায় চলো তো। বেশি সময় নেব না। কথা দিচ্ছি।

—কী রে? কী দেখাতে নিয়ে এলি এদিকে? এ যে সব...

—হ্যাঁ, এগুলো সব পুরনো বাইক। সেকেন্ড হ্যান্ড। এই মডেলটা দেখ একবার। রয়াল এনফিল্ডের ভিন্টেজ মডেল। গতকাল একজন রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার এসেছিলেন এখানে। বিক্রির জন্য রেখে গিয়েছেন। নাইন্টি থাউজ্যান্ড পেলে দেবেন। খদ্দেরও পেয়ে যাব তাড়াতাড়ি। কথাবার্তা চলছে এক-দু'জনের সঙ্গে।

—বলসি কী! নব্বই? সেকেন্ড হ্যান্ডের দামই নব্বই হাজার!

—হুম। কিন্তু এটা যা মানাবে না তোমার পার্সোনালিটির সঙ্গে! উফ, ভাবাই যাচ্ছে না। দুর্দান্ত!

—আমার সঙ্গে? মানে?

—রমেশদা, তুমি তোমার প্রাণকে আজ রাতে আমার কাছে গচ্ছিত রাখো। বুঝলে? পেপারস সমেত এটা দিয়ে দিচ্ছি। যাও, কাল অফিস কেটে বউদিকে নিয়ে হারা উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ো এতে চেপে। চলে যাও সোজা সেবকের দিকে। চমৎকার মাখনের মতো মসৃণ রাস্তা। নিচে অপূর্ব তিস্তা নদী। সেই যে টিভিতে যেমন দেখেছিলে না? ঠিক তেমন সুন্দর। কী? ব্যাপক আইডিয়া না?

—একদিনের জন্য হিরো হতে বলছিস রে? হা হা হা। সত্যি, এখনও ছেলেমানুষ আছিস তুই। এমনটাই থাকিস। পাল্টাস না। চলি।

—রাজি হলে না রমেশদা?

—নাহ রে। রাগ করিস না তুই। আমার সেই ভাঙা স্কুটারই ভালো। আমাদের পুরনো বাড়িটার মতো। আমাদেরও তো বয়স হচ্ছে। তোর বউদির, আমার। আস্তে আস্তে ভাঙন ধরছে দেহে মনে। বড্ড মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি যে রে। এ বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে বেরনো অসম্ভব। বলিউড হলিউডের কোনও নায়কের সে সাধ্য নেই। শ্রাবণীকে ভালোবাসা দিস। চলি।

—আমাদের ওখানে এসো কিন্তু একবার। শ্রাবণী খুব বলে তোমাদের কথা।

—অবশ্যই যাব তোর বউদিকে নিয়ে। তবে বাসে চেপে নয় কিন্তু।

—তবে কীসে?

—আমার সেই ভাঙা স্কুটারেই। পেছনে তোর বউদিকে বসিয়ে। হা হা হা। ভালো থাকিস। আসি।

—বলছ কী রমেশদা? এত কনফিডেন্স? অ্যাঁ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অঙ্কন : সুবল সরকার

ফালাকাটায় সুস্থ সংস্কৃতির প্রচারে ৪০ বছর ধরে ছুটে চলেছে ‘রানার’

ডুয়ার্সের অন্যতম জনপদ ফালাকাটা। সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও এর এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ওই ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে রানার নাট্য সংস্থা। ১৯৭৪ সনের ২৫ ডিসেম্বর ফালাকাটা ব্লকে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চারদশক পেরিয়ে রানার নিয়মিত নাট্যচর্চা, নাট্য উৎসবের আয়োজন ও বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখে আজও ছুটে চলছে। গ্রামীন পরিবেশে গড়ে ওঠা এই রানার এখন শুধু ডুয়ার্স বা উত্তরবঙ্গের মধ্যেই পরিচিত নয়। গোটা বাংলা তথা নিম্ন আসামের নাট্য জগতে পরিচিত নাম। শুধু নিজেদের নাট্য পরিবেশন নয়। ফালাকাটার মানুষকে ভাল নাটক দেখাতে, প্রকৃত অর্থে নাট্য দর্শন তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৮ থেকে রানারের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল আসাম বাংলা প্রতিযোগিতামূলক নাট্য উৎসব। ডুয়ার্স অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা তো বটেই কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন জেলার নাট্যদলগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এই উৎসবে। থাকে আসামেরও কিছু দল। পরিস্থিতি এখন এমন ওই উৎসব উপভোগ করতে অধীর অপেক্ষায় থাকে ফালাকাটা ও তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষ। আর এই উৎসবে প্রতিবছরই নিয়ে আসা হয় বাংলা সংস্কৃতির প্রথিতযশা শিল্পীদের। পাঁচদিনের এই উৎসবের মাধ্যমে নতুন বর্ষকে বরণ করে ফালাকাটাবাসী। কারণ, ধারাবাহিকভাবে এই পাঁচদিনের উৎসব শুরু হয় বড়দিনের সন্ধ্যায়। ২৫ ডিসেম্বর যে রানারের জন্মদিন।

শুধু বার্ষিকী উৎসবের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতি চর্চা নয়। নিয়মিত নাট্য প্রযোজনা করে থাকে রানার। বিগত দিনে রানারের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে রয়েছে অবরুদ্ধ ইতিহাস, অজাত ঈশ্বর, ফেরাইঘাট, ভোরাই খেয়া, প্রতিধ্বনী, শতাব্দির পদাবলী, রাজনিদ্রা, প্রফেসার বঙ্কু, নরক গুলজার প্রমুখ। ফালাকাটার নেতাজি রোডে অবস্থিত সংস্থার নিজস্ব মহলাকক্ষে মহড়া চলছে নতুন নাটক— মনোজ ভোজ রচিত ‘গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস’।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

আলিপুরদুয়ারে আবৃত্তি কর্মশালা

গত ৩০ জুলাই বিশিষ্ট কবি পরিচয় বসুর পরিচালনায় আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠিত হল এক আবৃত্তি কর্মশালা। বাচনিক ও আবৃত্তি নীড়ের সহযোগিতায় আলিপুরদুয়ার সিঞ্চুলা হোটেলে এই একদিনের আবৃত্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় মূল বিষয় ছিল ছন্দ। সেদিনের ওই কর্মশালায় আমন্ত্রিত ছিলেন অলোক ভট্টাচার্য, সুমন গোস্বামী, প্রমোদ নাথ, ড. সঞ্চিতা দাস, অম্বরিষ ঘোষ, পাপিয়া সরকার, সুকান্ত সাহা'র মতো বিভিন্ন আবৃত্তি শিল্পী এবং লেখক। তাঁদের পাশাপাশি ওই কর্মশালায় হাজির ছিল এলাকার বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল আবৃত্তি শিল্পকে আলিপুরদুয়ারের বুকে আরও প্রসারিত করা।

পৌলোমী গঙ্গোপাধ্যায়

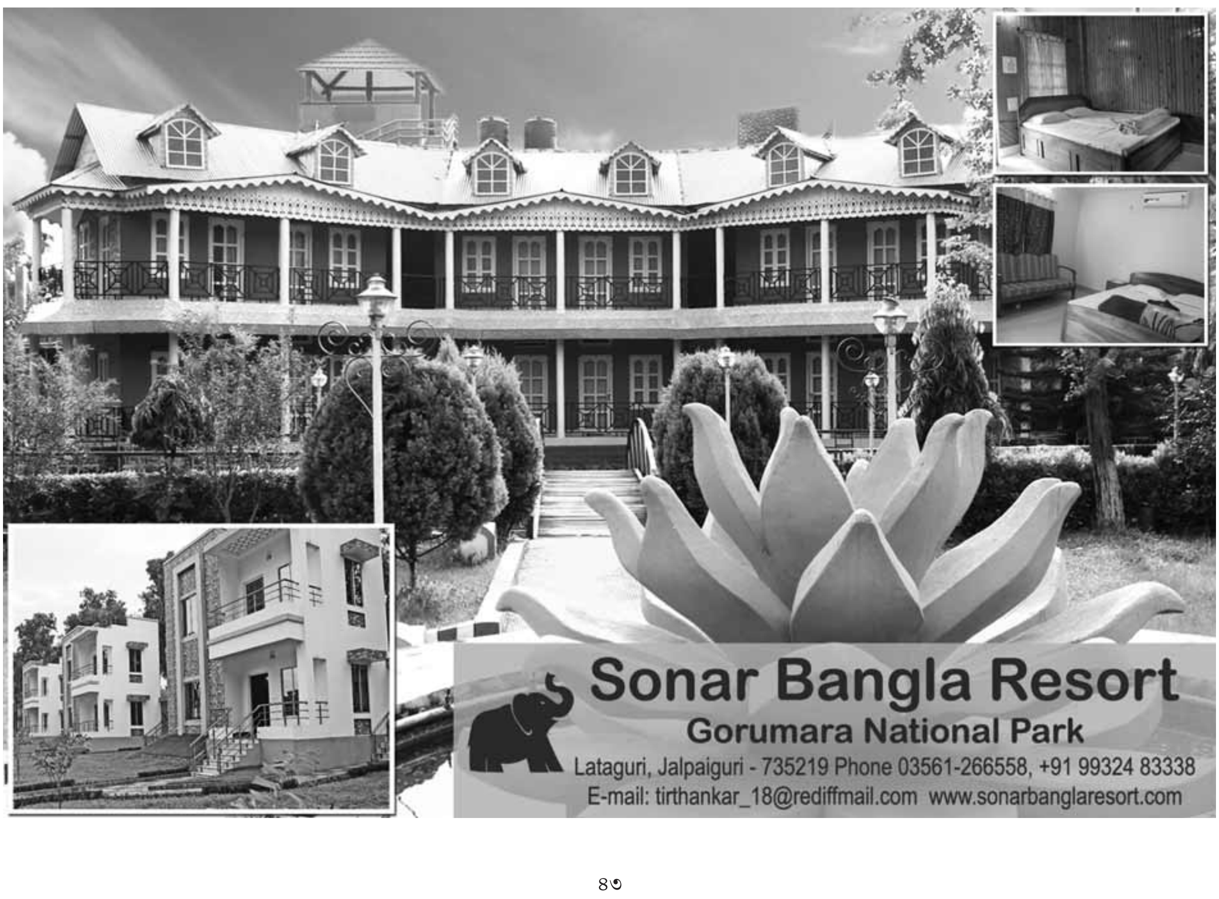

খাদি গ্রামোদ্যোগ উৎসবে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের সঙ্গে আলোচনায় ড. অনুপ কুমার পূজারি, সেক্রেটারি, মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস

সাফল্যের মুকুটে জুড়লো নতুন পালক

ব্র্যান্ডভূষণের ঝাঁ চকচকে ফ্লেক্স চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। তবু এখনও মায়ায় জড়িয়ে আছে সেই ঝুমকো, সেই কানবালা কিংবা আয়ত্তি অথবা কঙ্কন। ডুয়ার্সবাসী তথা বঙ্গবাসী মনের কোণে লুকনো বাসনা কী? তারা কী দুঃসাহসিকভাবে ভালবাসেন রাজস্থানী কুন্দন? না আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুরী ছাঁদের অননুকরণীয় ধরন? দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির ছাঁদের আভরণ সাজ? কিংবা সেমি প্রেশাস কস্টিউম জুয়েলারি পছন্দ তালিকার শীর্ষে থাকাটাও আশ্চর্য কিছু নয়! তাই খাঁটি তামার মধ্যে সোনার নকশা অনুকরণ করে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ২৩ ক্যারেট গোল্ড প্লেটেড থেকে রূপ দেওয়া হল ব্রেসলেট, নেকলেস, চেন, লকেট এমনকি মুক্তোর অলংকার। খাঁটি সোনার গহনা সবার সাধ্যে কুলোয় না। তা বলে কি মধ্যবিত্ত তনয়া বা বধূর গহনার সাজে অপরূপা হবে না? ওদের কথা ভেবেই স্বর্ণালঙ্কারের বিকল্প

মাইক্রোগোল্ড এনেছিলেন বিশ্বজিৎ পোদ্দার। উত্তর-পূর্ব ভারতে গয়নাকে ফরমুলার খাঁচা থেকে মুক্তি দিল তাঁর নকশাকাররা। তারপরই কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে কলকাতার পার্ক সার্কাস, বিরাটি, হাওড়া সহ আসাম ও এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গেল **বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড**-এর একাধিক শো-রুম। অবিশ্বাস্য স্বল্প মূল্যে গয়নার ফ্যাশনে এই বিপ্লব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল আই এস ও-র স্বীকৃতি। এবার সেই মুকুটেই যুক্ত হল আরও একটি পালক। গহনা তৈরির জন্য প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের নমিনেশন তো চলতি বছরের শুরুতেই মিলেছিল, তার সঙ্গেই আছে গহনার গুণ-মান। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে অভাবনীয় সাফল্যের কারণে খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে মিলল বিশাল সম্মান। স্বাধীনতার উনসত্তরতম দিবসে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গভূমি উৎসবে চলছে বি পোদ্দার মাইক্রোগোল্ড গহনার বিরাট প্রদর্শনী। দেশ তথা দেশের বাইরে তাদের গয়না নিয়ে প্রদর্শনীতে ব্যবসার জন্য মিলেছে অবাধ ছাড়পত্র। একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এর থেকে বেশি সফলতা আর কী হতে পারে। আগামী নভেম্বর মাসে দিল্লির প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হস্তশিল্প প্রদর্শনীতেও বি পোদ্দার মাইক্রোগোল্ডের গহনা প্রদর্শিত হবে বিশালভাবে।

ভারত সরকারের পুরস্কার সম্মান এসব তো আছেই, ব্যবসার ক্ষেত্রে যে অবাধ অনুমতি মিলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বি পোদ্দার মাইক্রোগোল্ড হয়ে উঠেছে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলা, আসামে তাদের শো-রুম খুলে গিয়েছে। কয়েকশো পরিবারের জীবন জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে এই শিল্পের কারিগর হিসেবে। খুব শীঘ্র ডুয়ার্স ও কলকাতায় খুলেছে বেশ কয়েকটি শো-রুম। অলঙ্কার শিল্পের কারিগরদের সামনেও স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ে দিচ্ছেন শ্রী বিশ্বজিৎ পোদ্দার। আগ্রহীরা স্বচ্ছন্দে যোগাযোগ করুন আর নিজের ভবিষ্যৎ মজবুত করুন।

P.M.E.G.P. Unit
under K.V.I.C.,
Govt. of India

B. PODDER MICRO GOLD

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

R. N. Road, Dakshinayan Building 2nd Floor, Cooch Behar, Pin - 736101 (W.B.)
Phone: 03582-228597 98320 92714, 8967863754

গাঙ্গুটিয়ার সনৎ চট্টোপাধ্যায় ডুয়ার্সের কবি আজ চোখে দেখতে পান না

ডুয়ার্সকে সমগ্র মনন আর জীবনচর্যায় জড়িয়ে ডুয়ার্সের গভীরেই পুরোটা জীবন কাটিয়ে ডুয়ার্সকে নিয়ে সৃজনজগৎ নির্মাণের অনন্য দৃষ্টান্ত সনৎ চট্টোপাধ্যায়। গাঙ্গুটিয়ার সনৎ চট্টোপাধ্যায়। চিনচুলা আউট ডিভিশনের সনৎ চট্টোপাধ্যায়। রায়মাটাংয়ের সনৎ চট্টোপাধ্যায়। আদিবাসী মানুষজনের কয়েক দশকের পরম সুজন সনৎ চট্টোপাধ্যায়। নেপালি আদিবাসী গান নাচ-এ আকণ্ঠ ডুবে থাকা সনৎ চট্টোপাধ্যায়। চা-পাতার গন্ধে মাখামাখি সনৎ চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'রাঙ্গালিবাজনা'র সূচনায় 'আমার কথা' মুখবন্ধে সনৎদা লিখেছিলেন—'আমার কথা বলতে গেলে, আমি যেখানে থাকি তার ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া দরকার। আমি কল্লোলিনী কলকাতা থেকে অনেক দূরে জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ব ডুয়ার্সের গাঙ্গুটিয়া চা-বাগানে থাকি। উত্তরে ভুটান পাহাড়। দক্ষিণে ডিমা নদী পেরিয়ে রাজাভাতখাওয়া অরণ্য হয়ে আলিপুরদুয়ার। পশ্চিমে আদিগন্ত সবুজ গালিচা পাতা চায়ের বাগান। পূর্বে শ্রমিকদের বাসস্থান ছাড়িয়ে শীর্ণকায়া ছোট নদী বয়ে চলেছে, নদী পার হয়ে অরণ্য আর অরণ্য।... আমি ছোটবেলা থেকে সবুজ চা-বাগানে আদিবাসী ও নেপালি শ্রমিকদের সঙ্গে লালিত পালিত হয়েছি। ভালবেসেছি চা-বাগানকে। ভালবেসেছি অরণ্য, মাদলের শব্দে আদিবাসী যুবক-যুবতীদের নাচ, ঢোলকির সঙ্গে নেপালি শ্রমিকদের ঝাউরে, মারুনি, ডংফু নৃত্য এবং সংগীত।... নানা ধরনের বিচিত্র পাখির ডাক, সন্ধ্যায় ভুটান পাহাড়ের দিক থেকে ঘরে ফেরা টিয়াদের কলরব আকাশ ছাপিয়ে যায়, সবই আমার মর্মে গাঁথা হয়ে রয়েছে। কালচিনি, হ্যামিলটন, হাসিমারা, মাদারিহাট পেরিয়ে বীরপাড়া যেতে যেতে বাসে বসে যেন শুনি অলৌকিক বাজনা... ডুয়ার্সের এই মনোহারিনী চিত্র বনের হরিণের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চারিপাশে। কালজানি, বাসরা, ডিমা, তোর্ষা, আংরাভাসার তীরে তীরে ছড়িয়ে রয়েছে ভাওয়াইয়া গানের দরিয়ার টান। শাল-সেগুন, চালতে গাছের পাতায় পাতায় লেগে রয়েছে ডুয়ার্সের সমস্ত সুষমা। সেই সুষমাই ছড়িয়ে আছে আমার মনে প্রাণে এবং আমার নিত্যদিনের দিনযাপনে।'

ডুয়ার্সের নির্ভেজাল সবুজতা থেকে চা-বাগিচা নদীনালা ঝোরা-ঝরনা আদিগন্ত বনবনানী থেকে, সর্বোপরি আদিবাসী লোকিক জনজীবন থেকে ডুয়ার্সের ব্যতিক্রমী সৃজনশিল্পী সনৎ চট্টোপাধ্যায়কে আলাদা করা যায় না। তিনি যদি শুধু কলম নিয়েই থাকতেন, বাংলার সাহিত্য অনন্য মাত্রা পেত ডুয়ার্সের অফুরন্ত সম্পদে। একটা অন্য ঘরানা তৈরি হয়ে যেত। কিন্তু সনৎ চট্টোপাধ্যায় তো একটি ঘরানায় আটকে থাকবার মানুষ নন। ছড়িয়ে যান আকাশের মতো। তাঁর গান শোনা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। মনে আছে, ধূপগুড়িতে জেলা ছাত্র যুব উৎসবের বিচারক হয়ে সনৎদা এসেছেন। আমিও তখন ধূপগুড়িতে সদ্য এসেছি। অনুষ্ঠান শেষে সনৎদা আর উত্তরের বিশিষ্ট লোকসংগীতশিল্পী সুনীল দাস-কে নিয়ে এলাম আমার ভাড়াবাড়িতে। সে রাতটি আমার কাছে আজীবনের সঞ্চয়। সারারাত আমরা ঘুমোইনি। এক নাগাড়ে সনৎদা গেয়ে চলেছেন। কী বিশাল তাঁর সংগ্রহ আর সৃষ্টি। নেপালি আর সাদরিতে মাতৃভাষার মতো অনায়াস। রবীন্দ্রসংগীত তাঁর প্রাণ। অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীত সেই কতকাল আগে নেপালি আর সাদরিতে অনুবাদ করেছেন। সে রাতে সেইসব গান শোনা এক বিরল অভিজ্ঞতা। গাঙ্গুটিয়ার অন্দরে বসে তিনি যে কাজ করে গিয়েছেন তার সঠিক মূল্যায়ণ হয়নি। গান আর কবিতাই তো নয়! সনৎদাকে ডুয়ার্সের আদিবাসী নাটকের প্রাণপুরুষ বলা যেতে পারে। তাঁর লেখা পরিচালনায় সাদরি ভাষার নাটক 'রৌরেমন' একের পর এক মঞ্চে অভিনীত হয়ে এক সময় দারুণ সাড়া ফেলেছিল। আলেখ্য 'সাক্ষরতা সে জঙ্গল বঁচাতক'-ও এক অপূর্ব নির্মাণ। অনেকে জানেন না, সনৎদা কী অসাধারণ আদিবাসী নাচ নাচতে জানেন। বাগিচার কোলে তাঁর সেই অনবদ্য শিল্প তো বহির্জগতের অজানাই রয়ে গেল!

নদিয়ার কৃষ্ণনগর মহকুমার বিল্ব গ্রামে ১৯৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সনৎ চট্টোপাধ্যায়-এর জন্ম। মদনমোহন তর্কালঙ্কার-এর গ্রাম এটি। তাঁর বংশধর তিনি। একথা বলতে গর্ববোধ করেন সনৎদা। মায়ের মৃত্যুর গল্প তাঁকে এখনও আচ্ছন্ন করে। স্মৃতিতে মায়ের আবছা ছবিটুকুও নেই। বাবা চা-বাগানে কাজ করতেন। সনৎদা'র আগের এক ভাই খুব অল্প বয়সে মারা যান। তারপর মায়ের চলে যাওয়া। কাকুর বিয়েতে বাবা সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় গিয়েছিলেন। মা শান্তিময়ী দেবী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। বাবা যেতে চাননি, মা-ই জোর করে পাঠিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন শান্তিময়ী আর বেঁচে নেই। দু-বছরের সনৎ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সন্তোষবাবু চলে আসেন ডুয়ার্সে। অর্থাৎ ১৯৩৬ সাল থেকে সনৎদার আত্মীয়তা ডুয়ার্সের সঙ্গে। বললেন, 'দু-বছরের একটা দুধের শিশুকে নিয়ে বাবা অথৈ জলে পড়েছিলেন। আমাকে আদিবাসী নেপালি কামিনদের সঙ্গে দিয়ে তিনি কাজে চলে যেতেন। আমি যে কত আদিবাসী নেপালি মহিলা চা-শ্রমিকের দুধ খেয়েছি! সেভাবেই বড়ে হয়ে ওঠা। এই ডুয়ার্সের সঙ্গে তাই আমার বুকের রক্তের ঋণ। এ ঋণ কি কোনওদিন শোধ করা যায়?'

বাবা ছিলেন হেড ফ্যাক্টরি-বাবু। কাজে কাজে তাঁর দিন কাটত। সনৎদা জড়িয়ে পড়লেন বাগিচার সহজ সরল মানুষগুলোর সঙ্গে। এ বন্ধন রক্তের বন্ধনের চেয়েও অনেক বেশি। ঠাকুরদা প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় রায়মাটাং চা-বাগানের হেড ক্লার্ক ছিলেন। তিনিই জোর করে সন্তোষবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ দেন। তখন সনৎদার বয়স মাত্র চার। এই মায়ের নাম করুণাময়ী। বাগানের স্কুলে প্রাথমিকের পড়ার পাঠ চুকিয়ে সনৎদা গেলেন কোচবিহারে। সেখানে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। শুরু হল হস্টেল-জীবন। সেখানে থাকলেও প্রতিদিন মন কাঁদত গাঙ্গুটিয়ার জন্য। নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন এ সময়ের বিখ্যাত কথাকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যেই তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে এক বোহেমিয়ান জীবন। কোনও বাঁধন নয়, রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি'র কিশোর 'তারাপদ'র মতো। স্কুল ফাইনালের পর কলকাতায় চলে যান সিনেমায় নামবার স্বপ্ন নিয়ে। সদ্য কিশোর ভাবছেন—হিরো হব। গেলেন ছবি বিশ্বাসের কাছে। কোনও আশ্বাস পেলেন না। এক আত্মীয় তাঁর আগ্রহ দেখে নিয়ে গেলেন বিখ্যাত অগ্রদূত গোষ্ঠীর অন্যতম বিমল ঘোষ-এর কাছে। তিনি সাফ বললেন, 'অভিনেতা হতে চাও? আগে মন দিয়ে পড়াশোনা শেষ করো। কলেজে ভর্তি হও। কলেজের নাটকে অভিনয় করে নিজেকে তৈরি করো। তারপর সিনেমার কথা ভাব। তাছাড়া ১৮ বছরের কম বয়সি কোনও সিনে স্টার নেই।' সনৎদা ভর্তি হলেন রাজা প্যারিমোহন কলেজে। এখনও তার স্মৃতি মনে স্পষ্ট—'যেখানে থাকতাম, দরজা দিয়ে গঙ্গার ওপারে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখা যেত। রাতে গঙ্গার নৈশ মূর্তি দেখে ভীষণ ভয় পেতাম।' এখানে পরপর তিনবার টাইফয়েডে আক্রান্ত হলেন তিনি। কাকা গিয়ে নিয়ে চলে এলেন ডুয়ার্সে। বাবা তখন পাটকাপাড়া চা-বাগানে। ইতিমধ্যে সংসারে সদস্যসংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। দ্বিতীয় মায়ের কোলে পাঁচ ভাই পাঁচ বোন এসে গিয়েছে। চা-বাগানের সামান্য মাইনের কর্মী বাবার উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। তিনি বললেন, 'আর পড়াতে পারব না।' কিন্তু অদম্য ইচ্ছায় বাবাকে রাজি হতে হল। ১৯৫৫ সালে সনৎদা ভর্তি হলেন জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে। শুরু হল এক অন্য জীবন। কলেজ সোশ্যাল মাতিয়ে দিলেন তরুণ টগবগে চা-বাগানের ছেলেটি। গানে গানে পাগল করে দিলেন অনেককে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সনৎদা কিন্তু কোনওদিন কারও কাছে গান শেখেননি। বাবা শখ করে ডোয়ার্কিন কোম্পানির একটি হারমনিয়াম কিনেছিলেন। সেটাতেই কখনও কখনও আঙুল ছোঁয়াতেন তিনি। বাড়িতে রেডিও বাজত। সেখানে শুনতেন পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সংগীত শিক্ষার আসর। রেডিও থেকে শুনেই একদিন একা একা হারমনিয়ামে তুলে ফেলেছিলেন 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে...'। এক নাগাড়ে চেষ্টা করে যখন গানটিকে হারমনিয়ামে প্রায় রপ্ত করে ফেলেছেন, হঠাৎ মাথায় কার আঙুলের স্পর্শ পেয়ে পেছন ফিরে দেখেন তাঁর রাশভারী বাবা সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

বেশ চলছিল আনন্দচন্দ্র কলেজের জীবন। সহপাঠী হিসেবে পেয়েছেন মানিক সান্যালকে। কলেজে এস.এফ.আই চালু হল। সরাসরি ঢুকে পড়লেন ছাত্র রাজনীতিতে। বামপন্থী ছাত্র-রাজনীতি যেন মিশে গেল রক্তের মধ্যে। কলেজ শেষে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় পার্টি অফিসে। সেখানে ডাকসাইটে নেতা পরিমল মিত্র, সুবোধ সেন-দের সান্নিধ্য।

তবে দ্বিতীয় বর্ষে উঠতে না উঠতেই একটি ঝড় এল সনৎদার জীবনে। হঠাৎ করেই দ্বিতীয় মা করুণাময়ী দেবী খবর পাঠালেন, 'তাড়াতাড়ি চলে এসো। তোমার বাবা চা-বাগানের চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। তুমি বড় ছেলে। সংসারের হাল ধরতে হবে।' ইতি পড়ল পড়াশোনায়। সনৎদা বাগানে ফিরলেন। শুরু করলেন গানের টিউশনি। বাগানে বাগানে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন কোয়ার্টারের বাচ্চাদের গান শেখাতে লাগলেন। সকালে সাইকেলে বেরিয়ে পড়ে রাতে ফেরা। ১৯৫৬-র শেষ দিকে। তিনি রায়মাটাং চা-বাগানের পাশ দিয়ে আছড়াপাড়া বাগানে যাচ্ছেন গান শেখাতে। উজ্জ্বল সবুজ শীতের সকাল। ওই বাগানের অবাঙালি ম্যানেজার হঠাৎ তাঁকে সম্ভাষণ করলেন, 'গুড মর্নিং, ইয়াং ম্যান।' তরুণ সনৎ উত্তর দিলেন, 'ইটস আ গুড মর্নিং ফর ইউ, বাট নট ফর মি।' ম্যানেজারবাবুর কোথাও যেন মায়া হল সুন্দর দর্শন প্রাণচঞ্চল ছেলেটির প্রতি। ১৯৫৬-তেই চাকরি পেলেন রায়মাটাং চা-বাগানে। পরবর্তীতে এক বছর বাদে চলে আসেন গাঙ্গুটিয়া বাগানে। রাজনৈতিক কারণে তাঁকেও এক সময় চাকরি থেকে ডিসমিসড হতে হয়েছিল।

তবে চা-বাগানের মানুষের পাশ থেকে তাঁকে কেউ কোনওদিন সরাতে পারেনি। তাঁর কোয়ার্টারেই বসত নাচ-গানের মহড়ার আসর। আদিবাসী শিল্পীরা ভিড় করে আসতেন সেখানে। ধামসা মাদলের ছন্দে প্রায়ই মাতোয়ারা কোয়ার্টার। ঘরনী উমা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়মিত তাদের আপ্যায়ন করতে হত। বাইরে আমন্ত্রণে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠান করতে যেতেন। যে পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক সেসব অনুষ্ঠানের জন্য পেতেন, সব বিলিয়ে দিতেন তাদেরই মধ্যে। ১৯৭৯ সালে শিলিগুড়িতে রাজ্য ছাত্র যুব উৎসবে প্রায় দশ হাজার মানুষের সামনে অভিনীত হয় তাঁর নাটক 'রৌরেমেন'।

এখনও সনৎদার স্মৃতিতে রবীন্দ্র-শতবর্ষের কথা জ্বলজ্বল করে। রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রাণের গভীরে, তিনি কি শতবর্ষে শান্তিনিকেতনে না গিয়ে পারেন? কাউকে না জানিয়েই শতবর্ষের মূল অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে চলে গিয়ে সেই অনুষ্ঠানের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। সে গল্প করতে গিয়ে এখনও উচ্ছ্বসিত নিয়ে ওঠেন। অথচ 'বিশ্বভারতী' যদি খোঁজ রাখত, ডুয়ার্সের এই সৃজনবাউল কত রবীন্দ্রসংগীত কী মুনশিয়ানায় সাদরি আর নেপালিতে কত বছর ধরে অনুবাদ করে চলেছেন। গেয়ে চলেছেন।

চারটি কবিতা সংকলন প্রকাশ পেয়েছে সনৎদার। 'একটি ভাল করে প্যান্ডেল কর', 'ডুয়ার্স আমার অরণ্য আমার', 'রাঙালিবাজনা' এবং 'কাক জ্যোৎস্নায় কালজানি'। অন্তত চল্লিশটি প্রকাশ পেতেই পারত। সারাজীবন ধরে লিখে চলেছেন মানুষটা। স্বীকৃতিবিহীন এক সুদীর্ঘ কাব্য-পর্যটন। প্রকাশিত চারটি কাব্যসংগ্রহের কপিও তাঁর কাছে নেই প্রায়। অথচ এগুলোর পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন। নিজে যেভাবে সহজ সরল জীবনযাপন করেছেন, তেমনি সহজ ঋজু উচ্চারণ তাঁর কবিতাতে। বেশিরভাগ কবিতাতে ডুয়ার্স স্থান পেয়েছে।

ডুয়ার্সের মোহময় নিসর্গ তাঁকে পাগল করেছে রোজ। দশকের পর দশক। নিসর্গ অবধারিতভাবেই তাই ঘুরেফিরে এসেছে বারবার। তাঁর ভাষায়—'আমি সারারাত সবুজ চায়ের পাতার উপরে/আসনপিঁড়ি হয়ে বসে থাকি।' এই ডুয়ার্সকে ছুঁয়েই তাঁর নির্মল বাক্যনির্মাণ—'পাহাড় থেকে ঝর্ণা হলাম/ঝর্ণা থেকে নদী হলাম/নদী বলে ডাকছে আকাশ/আকাশ ছুঁতেই মেঘ হলাম।' কিংবা 'চা-বাগানে অমল ফাল্গুন/আকাশে ডিস অ্যান্টেনার প্রহরা নেই/চা-বাগানে সরাসরি আকাশের নীলে ঝুলে থাকে/আমার ভালবাসার দৃষ্টিপাত।'

তাঁকে বরফঢাকা ভুটান পাহাড় আমন্ত্রচিঠি পাঠায়, চিতল হরিণ খবর পাঠায় গাঙ্গুটিয়া অরণ্য থেকে। সম্রাটের মতো পাহাড়ে পা রেখে কথা বলেন বিস্তীর্ণ প্রাণের নিখিলে। আদিবাসী রমণীর বাড়া ভাত খেয়ে সারাদিন গাছ আর পাখিদের সঙ্গে থাকেন। ভুটানি মেয়ের কাছে জেনে নেন বৌদ্ধ মন্দিরের পথ। আমাদের ডুয়ার্সের সনৎ চট্টোপাধ্যায় আরণ্যক রায়ডাক নদী থেকে 'চিকচিক সোনা বালু তুলে' ঢেকে দেন 'পবিত্র সুন্দর পদ্ম পাপড়ি পা'।

তিনিই আবার যন্ত্রণায় কাতর হন যখন অনুভব করেন—'এই চা-বাগানে মানুষও ছিল/সেই বহুদিন আগে/এখন চা-বাগানে মানুষ নেই/আছে শুধু করণিক।' ভীষণ কষ্ট পান, যখন শুনতে পারেন 'চা-গাছের সবুজ সুষমা, শান্ত নীরবতা/স্প্রেয়িং মেশিনে আর্তনাদ।/সদ্য কুঠারাঘাতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট বৃদ্ধ সেগুন মাটিতে শুয়ে থাকে।/ঘাতকের পরম তৃপ্তিতে সিগারেট লাইটার জ্বালে।' ছটফট করেন, যখন বুঝতে পারেন—'চা-বাগানে পায়ে চলা পথে/দু'পাশে সবুজ ঘাস যন্ত্রণায় কাঁদে/সভ্যতার আমদানি/গ্যামাক্সিন বিষে।/চা-গাছের বুকে ইউরিয়া ছড়িয়ে আসে/ব্যাওসায়ী ফ্লাস।'

১৯৯২ থেকে ২০০২ টানা ২০ বছর সম্পাদনা করেছেন মাসিক সাহিত্যপত্র 'উন্মেষ'। ডুয়ার্সের সাহিত্যে এই পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। স্বনামখ্যাত তিলোত্তমা মজুমদার-এর প্রথম লেখা এই পত্রিকাতেই প্রকাশ পেয়েছিল। 'লিটল ম্যাগাজিন মেলা-২০০২'-এ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-র কাছ থেকে সংবর্ধনা গ্রহণ করেন তিনি।

তুখোড় প্রাণবন্ত এই কবি এখন একেবারেই চোখে দেখতে পারেন না। কবিতার কলি ভিড় করে এলেও লিখতে পারেন না। গাঙ্গুটিয়া চা-বাগানের কোয়ার্টারে বড় একাকী দিন কাটে তার। খুব কম জন খোঁজ রাখেন কেমন আছেন একসময়ের ডুয়ার্স মাতিয়ে দেওয়া অসামান্য সৃষ্টিশীল মানুষটি। কাছে গেলে হাত ছুঁয়ে বসে থাকেন, চোখে জল চলে আসে।

অমিত কুমার দে

EKHON DUARS, Vol-2, Issue-6, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

রংরুটের যে বইগুলি এখন পাওয়া যাচ্ছে

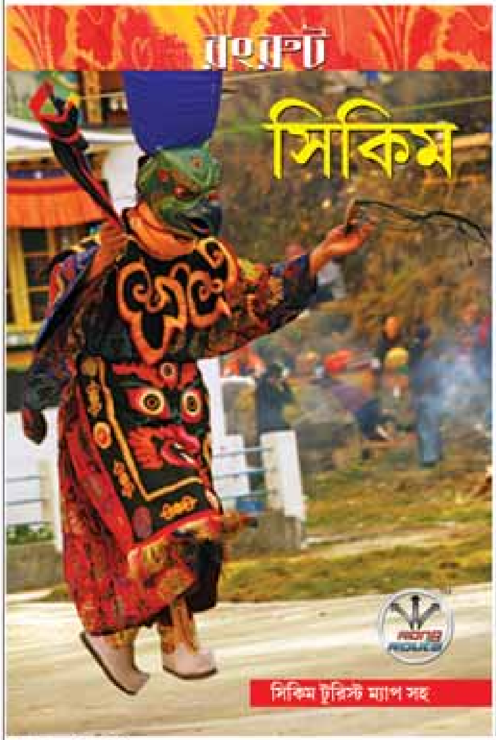

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ।
হার্ডবোর্ড বাঁধাই। **মূল্য ২০০ টাকা**

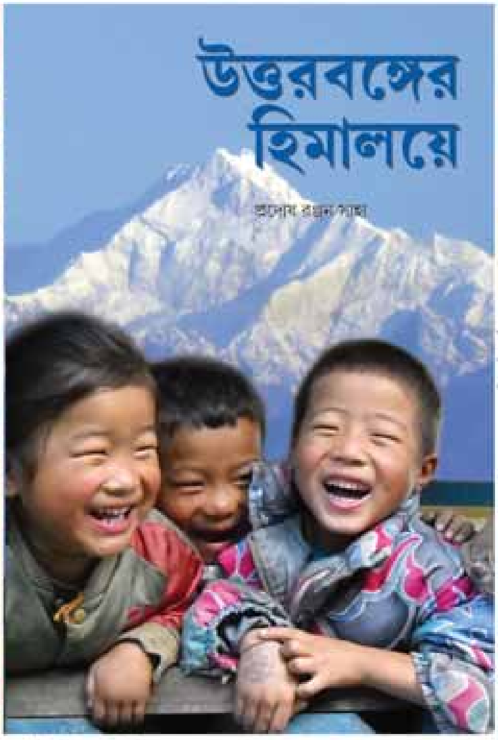

দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। **মূল্য ২০০ টাকা**

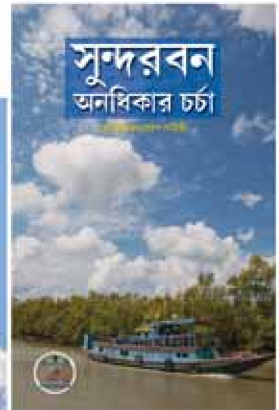

সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার আগে এই বই প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য।
মূল্য ১৫০ টাকা

সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। **মূল্য ১৫০ টাকা**

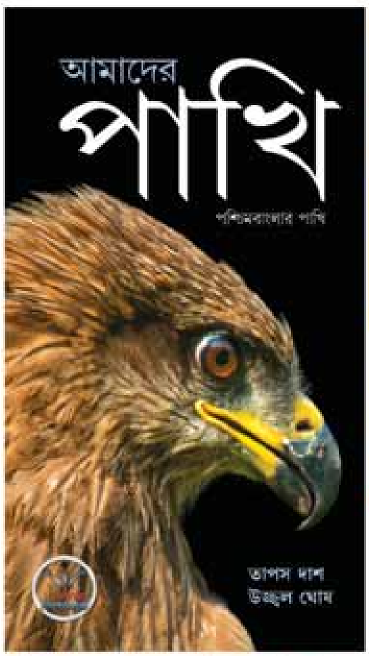

পশ্চিমবাংলার ৩৬০ প্রজাতির পাখির সচিত্র বিবরণ। হার্ডবোর্ড বাঁধাই। ৫০০ পৃষ্ঠা। আগাগোড়া রঙিন। বিদেশি আর্ট পেপারে ছাপা। **মূল্য ১০০০ টাকা।**

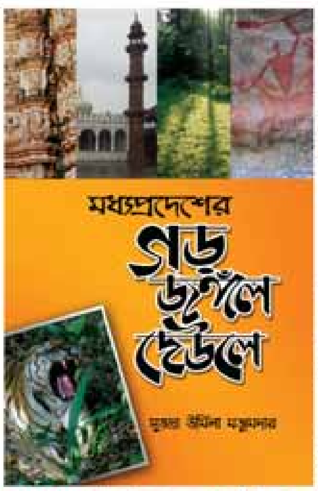

মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। **মূল্য ২০০ টাকা।**

আমেরিকার দশ কাহন
শান্তনু মাইতি। **মূল্য ১২০ টাকা**

মূল্য ৯০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

এই অবকাশে ১৮/৭ ডোভার লেন, কলকাতা ২৯, ফোন ৬৫৩৬ ০৪৬৩
অক্সফোর্ড ১৫ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ১৬, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩,
এছাড়া স্টারমার্ক-এর সবকটি শোরুমে পাওয়া যাবে।
কল্যাণী **কালার্স** বি ১০/৩২০, অনুপম ফার্মাসির কাছে, ফোন ৮৪২০১৮৭০০৬
বোলপুর শান্তিনিকেতন **সুবর্ণরেখা**, শিলিগুড়ি **ইকনমি বুক স্টল** কলেজ রোড, জলপাইগুড়ি **ভবদার দোকান**, কমার্স কলেজের উলটো দিকে কোচবিহার **অ্যালফাবেট** স্টুডেন্ট হেলথ হোমের উলটো দিকে

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.